দি নিউ মাণিক লাইব্রেরী—৯৮/২, রবীন্দ্র সরণী, কলিঃ-৬

শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস ১৮, খিলাত ঘোষ লেন কলিঃ-৬, হইতে প্রকাশিত।

দি নিউ পশুপতি প্রেস, ৩৩১, রবীন্দ্র সরণী কলিকাতা-৫ হইতে

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রী৺শীতলা মাতার শ্রীচরণ কমলে আমার সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি এই "প্রথম পাণিপথ"।

মা !

জীবন যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হয়ে মানুষ যখন আশা ভরসা দুইই হারায়, তখন নির্ভর করে দেব দেবীর উপর। আমিও তা করেছিলাম। সেদিন বুঝিনি, মৃন্ময়ী মায়ের অন্তরালে সদা জাগ্রতা আমার চিন্ময়ী মা। প্রার্থনা—তোমার অকৃপণ অনুগ্রহে আজকার এই অনুভূতি যেন চির অক্ষয় হয়ে থাকে।

হাসির হাট ! অশ্রুর ঝর্ণা ! বীরত্বের গৌরব !

নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত

শ্রীকানাইলাল নাথ রচিত

নূতন ঐতিহাসিক নাটক

আহ্বান

আহ্বান ! আহ্বান ! কিন্তু কার আহ্বান ?

একদিকে দীর্ঘদিন আগে ভারতের বুক থেকে হারিয়ে যাওয়া আরবের প্রাসাদে আরব-বাদশা হিজ্জাজের স্নেহের শৃঙ্খলে বন্দিনী জুমেলারূপী জয়ার প্রতি ভারতের মাটির আহ্বান, আর একদিকে আরবী বণিক হাসান আলির অত্যাচার থেকে জন্মভূমি ভারতের মাটিতে ভারতীয় নারী করুণার সম্ভ্রম রাখতে স্বদেশবাসীর প্রতি সিন্ধু-অধিপতি রাণা দাহিরের আহ্বান। কিন্তু এই আহ্বানে কেউ কি সাড়া দিয়েছিল ? হ্যাঁ, দিয়েছিল। আত্মভোলার ছদ্মবেশে রাণার কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়কুমার, দস্যুর আবরণে সন্ন্যাসী জয়ন্ত, স্বার্থান্বেষী দাদা ধীরমলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশভক্ত বীরমল, আর বিদেশী আরবী সন্তান মনসুর,—কিন্তু আরব-সেনাপতি বিন কাসেম্ আলির উদার মানবতার অস্ত্র ভেঙ্গে দিয়ে। বাদশা হিজ্জাজ আলির চক্রান্ত, শক্তিপুররাজ ডিণ্ডিপ্রসাদের সহযোগিতায় রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্জ্জয় কুমারের বিশ্বাসঘাতকতা কোনদিন কি এই আহ্বান ব্যর্থ করেছিল ? ভারতের মেয়ে জয়া আবার কি একদিন তার জন্মদাতা ভক্ষণীর পাগলার বুকে ফিরে আসতে পেরেছিল ? ভারতীয় নারী করুণার সম্ভ্রম রাখতে রাণা দাহিরের আকুল আহ্বান কোনদিন কি সফল হয়েছিল ? পড়ুন, সমস্যার সমাধান হবে। মূল্য ২.৭৫ টাকা।

মসনদ কার সুপ্রসিদ্ধ কালুরায় অপেরার বিজয় নিশান। শ্রীপ্রসাদ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। নূতন ঐতিহাসিক নাটক। দিল্লীর মসনদ লইয়া অনেক রক্তপাত হইয়াছে, অনেক মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘটিয়াছে, এ তাহারই একটী প্রাণবন্ত ঐতিহাসিক নাট্যরূপ। নীচ জাতীয় হিন্দু খসরু বিদেশী তুর্কীর নির্য্যাতনে হ'ল ধর্ম্মান্তরিত মুসলমান ; নিজের বুদ্ধিবলে মাত্র কয়েকদিনের জন্য অধিকার করলো ভারতের মসনদ। তারপর তারই বুকের রক্তে সিক্ত হ'ল ভারতের মাটী, তারই বেদনাজড়িত কণ্ঠের ভাষা "মসনদ, তুমি কার ?" মূল্য ২.৭৫ টাকা

দি নিউ মাণিক লাইব্রেরী—১৮/২, রবীন্দ্র সরণী, কলিঃ-৬

ভূমিকা

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। তাই ভূমিকার অবতরণে ভাষার বোঝা না বাড়ানোই ভাল। এই যুদ্ধেই যে পাঠান রাজত্বের অবসান ও মোগল শাসনের ভিত্তিস্থাপন একথা সবাই জানেন। একদিকে অত্যাচারী পাঠান সুলতান ইব্রাহিম লোদী, অন্যদিকে লুণ্ঠনকারী বাবর। একদিকে দৌলত খাঁর স্বাজাতী ধ্বংসে বিদেশীকে আহ্বান, অন্যদিকে রাণা সংগ্রাম সিংহেব হিন্দু রাজ্যস্থাপনের ব্যর্থপ্রয়াস। ইহাই নাটকের প্রধান ঘটনা। নাটক ইতিহাস নয়, সেজন্য নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত রক্ষার্থে কল্পনাব আশ্রয় নিতে হয়েছে। আশাকরি আমার অপরাধ মার্জ্জনীয়।

যাহা হউক, এই নাটকখানি আমার বন্ধুবব সুগায়ক শ্রীবিপিনচন্দ্র নস্করের চেষ্টায় ক্যালকাটা মিলন বিথী অপেরায় স্থান পায়। তারপর উক্ত পার্টির সুঅভিনেতা ও স্বত্বাধিকারী শ্রীতারকচন্দ্র পাল মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে নাটকখানি দর্শক সমাজে খ্যাতি অর্জ্জন করে, সেজন্য তাঁদের কাছে আমি ঋণী। পরে আমার গ্রামস্থ শাসন যুবক সমিতি ও শাসন বালক সংঘ অসময়ে আমাকে যে সাহায্য দান করেন সেজন্য ঐ দুটি সংঘের প্রতিটী সভ্যকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। পরিশেষে আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত সত্যদাস চট্টোপাধ্যায় (কানাইদা) আমার দুর্ভাগ্যের দিনে, যে উপকার করেছেন তার জন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

যাদের নিয়ে নাটক

—পুরুষ—

ইব্রাহিম লোদী	...	...	ভারত সম্রাট।
দৌলত খাঁ	...	...	পাঞ্জাব সুবাদার।
আলম খাঁ	...	..	ঐ সহকারী।
রেজা খাঁ	...	...	ঐ সিপাহশালার।
সংগ্রাম সিংহ	...	...	মেবারের রাণা।
উদয় সিংহ	...	...	ঐ পুত্র।
তেজ সিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি।
বাবর	...	...	কাবুল সম্রাট।
হুমায়ুন	...	...	ঐ পুত্র।
কেরামত	...	...	দরিদ্র চাষী।
বিক্রমজিৎ রায়	...	...	দেওয়ান।
ঈশান	...	...	গ্রামবাসী।
রহমত	...	...	মুসলমান যুবক

বান্দা, ফকীর, রক্ষী ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

কর্ণদেবী	...	...	সংগ্রাম সিংহের স্ত্রী
মেহের	..	...	কেরামতের কন্যা।
রিজিয়া	...	...	দিল্লীর বেগম।
ছায়াবেগম	...	...	পরিচয়হীনা বাঈজী।

"অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্তন নিষিদ্ধ।"

—যাত্রাদলে অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী—

কে তুমি ?

শ্রীগোকুল চন্দ্র শীল রচিত। যুগান্তকারী কাল্পনিক নাটক। রাজা শক্তিধরের দুর্ব্বলতার সুযোগে সেনাপতি বজ্রমুখের সেচ্ছাচারিতা, নারী নির্যাতনে অঞ্জনগড়ের বুকেজ্বলে উঠলো অশান্তির অনল, রাজপুত্র বসন্ত কুমার হয়ে ওঠে লম্পট ও সিংহাসন লোভী বিজয়কুমার সর্দ্দার রাজের কন্যা গীতাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দান করার অপরাধে রাজ্য হতে হলো নির্ব্বাসিত। বিদ্রোহী নেতা গনপতির নেতৃত্বে প্রজারা হলো সসস্ত্ররাজবিদ্রোহী। এদিকে ডাকাতের আঘাতে প্রতিবেশী রাজা দেবনারায়ণের জীবনে নেমে এলো অন্ধকার, হারিয়ে গেল স্ত্রী পুত্র কন্যা, কেমন ক'রে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলো মায়াকে পুত্র বধু ক'রে, সব সমস্যার সমাধান হবে নাটকের শেষ অঙ্কে পড়ুন! অভিনয় করুন! মূল্য—২'৭৫ টাকা।

বউ রাণীর দেশ

কল্পনার সাগর শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত সুপ্রসিদ্ধ ক্যালকাটা অপেরার নূতন কাল্পনিক নাটক। রাজা রুদ্রপ্রতাপের সংসারে বউরাণীই সব। একমাত্র পুত্রকে নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে বড় আশা নিয়ে পুত্রবধূ বউরাণীকে করলেন সংসার-কারায় বন্দিনী, কিন্তু সে আশা তাঁর কে ভেঙ্গে দিল ? আর কেনই বা তাঁকে দত্তক নিতে হয় ? আর বউরাণী—স্বামীর ঘর নারীর সেরা তীর্থ জেনে গর্ভধারিণী আর ভাইকে শত্রু ক'রেও শ্বশুরের আদর্শে জীবন-যাত্রা সুরু করেন ; কিন্তু মিথ্যা দুর্নামের বোঝা নিয়ে কেন ছাড়তে হয় স্বামীর ঘর ? কি কারণে বউরাণীর পিতৃরাজ্যের সঙ্গে রাজা রুদ্রপ্রতাপের বাধল তুমুল যুদ্ধ ? কার শয়তানিতে রাজা রুদ্রপ্রতাপ নিজ হাতে একমাত্র বংশধর প্রদীপকে হত্যা করলেন ? দেখুন এই নাটকে। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

গৃহলক্ষ্মী

নট ও নাট্যকার শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। সুপ্রসিদ্ধ শ্যামসুন্দর অপেরায় অভিনীত। নূতন কাল্পনিক নাটক। ধনী-দরিদ্রের সংঘর্ষে সমাজ-বুকে যে বিষক্রিয়া প্রতিফলিত হয়, এই গৃহলক্ষ্মী তারই জীবন্ত আলেখ্য। ঐশ্বর্য্যের দম্ভে রাজরাণী কাদম্বিনী যখন একটি পুত্রবধূর লাভের চিন্তা করছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে রাজপুত্র অলক দরিদ্রকন্যা ইন্দ্রাণীকে গৃহলক্ষ্মীরূপে নিয়ে উদয় হ'ল, মাতার স্বপ্ন টুটে গেল ; ফলে আরম্ভ হ'ল বধূ-নির্য্যাতন। ইন্দ্রাণী হাসিমুখে সে নির্য্যাতন সহ্য করে আদর্শ নারীত্বের পরিচয় দিল। ফলে ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা রাজরাণী তাকেই গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ করেন। মূল্য ২'৭৫ টাঃ

প্রথম পাণিপথ

———:(০):———

প্রথম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

মেবার।

গীতকণ্ঠে পুরনারীগণের প্রবেশ।

পুরনারীগণ।—

গীত।

সোনার দেশের সোনার মাটি লহ নমস্কার।
তোমার চরণ করিলে শরণ রবে না তিমির আর॥
তোমার মাটির ফুল ও ফলে
কতই সুধা সাগর-জলে,
তোমার করুণা বয় শতধারে মুছাতে আঁখির ধার।

উদয়ের হাত ধরিয়া সংগ্রাম সিংহের প্রবেশ।

সংগ্রাম। প্রণাম কর উদয়! জন্মভূমি মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম কর।

উদয়। [প্রণাম করিল]

সংগ্রাম। বল, ওগো জন্মভূমি মা! তুমি আমার অন্তরে সাহস দাও, বাহুতে শক্তি দাও।

উদয়। ওগো জন্মভূমি মা! তুমি আমার অন্তরে সাহস দাও, বাহুতে শক্তি দাও।

সংগ্রাম। আজ কি দিন জান উদয়?

উদয়। না বাবা।

সংগ্রাম। আজ মেবারের স্বাধীনতা দিবস। এই পুণ্যদিনেই আমি পাঠানসম্রাট ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলাম।

উদয়। এখন আমরা স্বাধীন বাবা?

সংগ্রাম। হ্যাঁ বাবা, তবে এ স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারব কিনা জানি না।

উদয়। কেন বাবা?

সংগ্রাম। পাঠানসম্রাটের শক্তির তুলনায় মেবারের সৈন্যবল নিতান্ত তুচ্ছ উদয়।

উদয়। পাঠানের অনেক সৈন্য, অনেক কামান, অনেক তলোয়ার আছে না বাবা?

সংগ্রাম। হ্যাঁ উদয়।

উদয়। আমাদের তা নেই কেন বাবা?

সংগ্রাম। ইব্রাহিম লোদী সারা ভারতের সম্রাট, তাই তার শক্তি আমার চেয়ে অনেক বেশী।

উদয়। ভারতের সম্রাট হতে পারলে তার বুঝি খুব শক্তি হয় বাবা?

সংগ্রাম। হ্যাঁ বাবা!

উদয়। তাহ'লে তুমিও ভারতের সম্রাট হও।

সংগ্রাম। ভারতসম্রাট হওয়া মুখের কথা নয় উদয়। পাঠানসম্রাট

ইব্রাহিম লোদীকে শক্তিবলে পরাজিত করতে না পারলে, তার হাত থেকে দিল্লীর সিংহাসন ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না।

কর্ণদেবীর প্রবেশ।

কর্ণ। ছেলেব কানে আবার কি মন্ত্র দিচ্ছ?

সংগ্রাম। মুক্তিমন্ত্র দিচ্ছি রাণী।

কর্ণ। মুক্তিমন্ত্র?

সংগ্রাম। হ্যাঁ; বিদেশীব কবল থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার বীজমন্ত্র ঢেলে দিচ্ছি উদয়ের কানে।

কর্ণ। ওর এখন লেখাপড়া শেখার সময়। ওসব কথা ওর কাছে বলছো কেন মহারাণা?

সংগ্রাম। ও যে সিংহশিশু কর্ণদেবী। মাঝে মাঝে ওর কাছে যদি শিকারের গল্প না করা যায়, তাহলে রক্তের আস্বাদ ভুলে গিয়ে শৃগাল হয়ে যাবে।

কর্ণ। তাই মেবারেব স্বাধীনতা উৎসবের দিনে ছেলের সংগে গোপন আলোচনা হচ্ছে বুঝি?

সংগ্রাম। হ্যাঁ।

কর্ণ। মহারাণা!

সংগ্রাম। বল?

কর্ণ। ভারত যেখানে পাঠানের পদানত, সেখানে একা তুমি কি স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে?

সংগ্রাম। না পারি মরতে তো পারবো?

কর্ণ। মহারাণা!

সংগ্রাম। নিজের দেশকে পরের পায়ে বিলিয়ে দিয়ে বাঁচতে আমি

চাই না রাণী। আমি রাজপুত, আমি সিংহের বংশধর, শৃগালের পায়ে মাথা নীচু করতে পারবো না।

গীতকণ্ঠে ফকির সাহেবের প্রবেশ।

ফকির।—

গীত।

এগিয়ে চল বীর।
ঊর্ধ্বে তোমার বিজয় নিশান, করো না গো নত শির।
মানুষেরে তুমি বাসিয়াছ ভালো,
কেটে যাবে নিশা, আসিবে যে আলো,
কেন ভয়? হবে জয়, ঝরিবে না আঁখিনীর।

কর্ণ। ফকির সাহেব, বহুদিন পরে আপনার দর্শন পেলাম।

ফকির। ভাল আছো তো মা?

কর্ণ। হ্যাঁ বাবা।

সংগ্রাম। আজ বড় আনন্দের দিন। মেবারের স্বাধীনতা-উৎসবের দিনে আপনার সাক্ষাৎ পেলাম।

ফকির। মেবারের স্বাধীনতা-উৎসব বলেই তো দিল্লী থেকে ছুটে আসছি মহারাণা।

সংগ্রাম। ফকির সাহেব! মুসলমান হয়েও হিন্দুর ওপর আপনার এত ভালবাসা?

ফকির। ভালবাসা হিন্দুর উপর নয় মহারাণা, আমার ভালবাসা ভারতবাসীর উপর।

সংগ্রাম। ফকির সাহেব!

ফকির। বিদেশী পাঠানের অত্যাচারে আজ ভারতের হিন্দু-

মুসলমানের চোখের জলে নদী বয়ে যাচ্ছে । কিন্তু মহারাণা ! আমি ফকির, আমি চাই এ অত্যাচারের অবসান।

[প্রস্থান ।

সংগ্রাম। মহারাণী ! তুমি উদয়কে নিয়ে প্রাসাদে যাও।

কর্ণ। আর তুমি ?

সংগ্রাম। আমি একবার দুর্গের বাহিরে যাবো।

কর্ণ। একা ?

সংগ্রাম। ভুলে যাচ্ছো কেন দেবা ! আমি রাণা সংগ্রামসিংহ, যাও।

কর্ণ। আয় উদয়, আমরা যাই।

[উদয় সহ প্রস্থান ।

সংগ্রাম। মেবার ! মেবার ! আমার পুণ্যতীর্থ স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি মেবার ! আশীর্বাদ কর মা, রাণা সংগ্রামসিংহ যেন জীবন দিয়েও তোমার স্বাধীনতার গৌরব-সূর্যকে চির উজ্জ্বল করে রাখতে পারে।

মেহেরকে লইয়া কেরামতের প্রবেশ ।

কেরামত। রাণা সংগ্রাম সিংহ কই ? কোথায় রাণা সংগ্রাম সিংহ ?

সংগ্রাম। রাণা সংগ্রাম সিংহকে তোমার কি প্রয়োজন আগন্তুক ?

কেরামত। প্রয়োজন তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি বলবো না। বল, বল কোথায় মহারাণা ?

সংগ্রাম। মহারাণা তোমার সম্মুখে।

কেরামত। আপনি ? আপনিই মহারাণা ?

সংগ্রাম। তোমার পরিচয় দাও আগন্তুক।

কেরামত। আমি একজন মুসলমান চাষী। মহারাণা, আপনি আমার এই মা-হারা মেয়েটিকে রক্ষা করুন।

সংগ্রাম! কেন ভাই? কি হয়েছে তোমার কন্যার?

কেরামত। পাঠানসম্রাট ইব্রাহিম লোদী জোর করে আমার মেহেরকে তার হারেম নিয়ে যেতে চায়।

সংগ্রাম। কেন? তোমার মেহেরের অপরাধ?

কেরামত। অপরাধ? [ইতস্ততঃ করিল] তার রূপ।

সংগ্রাম। সম্রাটকে কন্যাদান করতে তোমার আপত্তির কারণ কি?

কেরামত। সে মানুষ নয় মহারাণা। তার অন্তরে বাস করছে একটা ঘুমন্ত পশু। এ পর্যন্ত সে আমার মেহেরের মত বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছে।

সংগ্রাম। সে দেশের সম্রাট। তার হাত থেকে তোমার মেহেরকে রক্ষা করার মত ক্ষমতা আমার কই ভাই?

কেরামত। মেহের! ওরে! তাহলে আমি কি ভুল শুনেছিলাম?

মেহের। বাবা!

কেরামত। চল মা, চল। ওরে, শুনেছিলাম রাজপুত সংগ্রাম সিংহ সত্যই সিংহ; তাই বড় আশা করে তার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি ভারতের বুকে সিংহ বলতে কেউই নেই, সবাই শিয়াল। চল মা, আমরা ফিরে যাই।

সংগ্রাম। দাঁড়াও।

কেরামত। কেন মহারাণা?

সংগ্রাম। মুসলমান হয়ে হিন্দুর বাড়ীতে এসে এত সহজে ফিরে যাওয়া যায় না।

কেরামত। মহারাণা!

সংগ্রাম। সিংহের গহ্বরে একবার প্রবেশ করলে সে আর ফিরে যেতে পারে না।

কেরামত। মহারাণা! আপনি কি আমাদের—

সংগ্রাম। আজীবন বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

কেরামত। কোথায়?

সংগ্রাম। আমার অন্তরে, স্নেহের বন্ধনে।

মেহের। (সংগ্রামকে) বাবা।

সংগ্রাম। ভয় কি মা? মেবারেশ্বর মহারাণা সংগ্রাম সিংহের কাছে যখন এসে পড়েছ, তখন তার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে সে তোমাকে পরিত্যাগ করবে না; করতে পারে না।

কেরামত। মহারাণা, আপনি—

সংগ্রাম। আমি মানুষ। তোমাদেরই মত মানুষ।

কেরামত। কিন্তু আমরা তো মুসলমান?

সংগ্রাম। মুসলমান হলেও তোমরা আমার ভারতবাসী—আমার ভাই। তোমাদের দুঃখে আমি কাঁদবো কিন্তু পাঠানের দুঃখে আনন্দে হাসবো। তোমাদের জন্য প্রয়োজন হলে আমি হাসতে হাসতে আমার জীবন দেবো। তোমাদের রক্ষায় যদি বিপর্যস্ত হয় আমার মেবারের স্বাধীনতা, রণোন্মত্ত পাঠানসৈন্যের পদচাপে যদি কম্পিত হয় আমার সাধের জন্মভূমি, তবু আশ্রিতকে শত্রুহস্তে তুলে দিয়ে শিশোদয় বংশে কলংক আরোপ করতে আমি দেবো না।

কেরামত। জয় মহারাণা সংগ্রাম সিংহের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কেরামতের বাটী।

বিক্রমজিৎ সহ রেজা খাঁর প্রবেশ।

বিক্রম। আসুন—আসুন, এই যে খড়ের ছাওয়া ভাঙা কুঁড়ে—এইটিই কেরামত আলীর বাড়ী।

রেজা। এই কেরামতের বাড়ী?

বিক্রম। হঁ্যা। এই ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো ঠিকরে পড়েছে।

রেজা। কি বলছেন আপনি?

বিক্রম। ঠিকই বলছি। খাঁ সাহেব বোধ হয় ভেবেছিলেন বিরাট তিন মহলা বাড়ী, চারিদিকে তার সেপাই।

রেজা। না না, তা কেন? সিপাহী শান্ত্রী বা বিরাট অট্টালিকা না হলেও যেখানে মেহের বাস করছে—

বিক্রম। ভুল খাঁ সাহেব, ভুল। এটা তো আপনার আফগানীস্থান নয়, এটা সোনার ভারত।

রেজা। আচ্ছা, মেহের কি খুব সুন্দরী?

বিক্রম। সুন্দরী মানে? বুঝতে পারছেন না? সুন্দরী না হলে সম্রাটের নজরে পড়ে? এখন যান, দুর্গা বলে, থুড়ি আল্লা বলে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ুন।

রেজা। আপনি আগে চলুন।

বিক্রম। মাফ করবেন। কেরামত আমাকে চেনে, কাজেই একটা চক্ষুলজ্জা আছে তো?

রেজা। আপনি কেরামতকে সম্রাটের আদেশ জানিয়ে ছিলেন ?

বিক্রম। জানাইনি ?

রেজা। কি বললে সে ?

বিক্রম। যা বলেছে সে আর শুনে দরকার নেই, এক্ষুনি রক্ত গরম হয়ে উঠবে ; তার চেয়ে এগিয়ে যান—

রেজা। আপনি ?

বিক্রম। আমি এখানে একটু অপেক্ষা করি। আপনি মেহেরকে নিয়ে ঘোড়ায় উঠলেই আমি দুর্গা বলে বাড়ীর দিকে রওনা হবো।

রেজা। তবে এখান থেকেই ডেকে দেখি। কেরামত ! কেরামত বাড়ী আছিস ? কেরামত—

বিক্রম। তাইতো খাঁ সাহেব, সাড়া শব্দ নেই যে ?

রেজা। কেরামত, বাড়ী আছিস ? কেরামত—

ঈশানের প্রবেশ।

ঈশান। কে রে ? কুকুরের মত চেঁচামেচি করে কে ?

বিক্রম। তোর বাবা রে ব্যাটা।

ঈশান। খবরদার রায় মশাই ! বাপ তুলে কথা বললে ভাল হবে না বলছি।

বিক্রম। জানিস, আমি গোয়ালিয়রের রাজা ?

ঈশান। আপনি যে একজন পবননন্দন তা আর আমার চিনতে বাকী নেই।

বিক্রম। কি নন্দন বললি ?

ঈশান। পবননন্দন, মানে হনুমান।

বিক্রম। চোপরাও ব্যাটা বেয়াদপ ! এখনি তোকে কোতল করবো।

ঈশান। আপনাকে কে কোতল করে তার ঠিক নেই, আপনি করবেন আমাকে কোতল! গোয়ালিয়রের রাজা হয়ে আজ আপনি এসেছেন কিনা সুলতানের হুকুমে একটা মেয়েছেলে ধরতে!

রেজা। কেরামত কোথায়?

ঈশান। পালিয়েছে।

রেজা। সে কি?

ঈশান। আর সে কি? আপনাদের জ্বালায় বৌ-ঝি নিয়ে বাস করা দায়। না পালিয়ে করবে কি?

বিক্রম। কখন গেল? কোথায় গেল?

ঈশান। কোথায় গেছে সে কি আর আমায় বলে গেছে মশাই? খুঁজে দেখুন, আমি চলি।

রেজা। সর্বনাশ রায় মশাই। মেহেরকে নিয়ে যেতে না পারলে সম্রাট যে আমাদের কোতল করবেন।

বিক্রম। তা তো করবে খাঁ সাহেব, কিন্তু এখন উপায় কি? দেখ ঈশান, তুই যদি তাদের ঠিকানাটা বলে দিতে পারিস, তাহলে তোকে মোটা পুরস্কার দেবো।

ঈশান। তাদের ঠিকানা আমি জানি না রায় মশায়। আর জানলেও বলতাম না।

বিক্রম। কি বলছিস ঈশান?

ঈশান। ঠিকই বলছি রায় মশায়। ঈশান চাষী; মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাঠে সোনার ফসল ফলায়—মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ের তার অভাব নেই। তাই পুরস্কারের লোভে একটা মেয়েছেলের সর্বনাশ করতে সে পারবে না।

রেজা। আমি তোর গায়ের চামড়া খুলে নেবো শয়তান।

ঈশান। সে ভয় ঈশান মণ্ডল করে না। জীবন আমাদের হাতের মুঠোয়, পাঠানের রাজত্বে বাস করে বাঁচার আশা আমরা কমই করি খাঁ সাহেব! কমই করি।   [প্রস্থান।

বিক্রম। বেটাকে কোতল করুন খাঁ সাহেব। ও ব্যাটা সব জানে।

রেজা। ওসব কথা ছেড়ে এখন নিজেদের কথা ভাবুন।

বিক্রম। মেহেরকে পেতেই হবে।

রেজা। কি ভাবে?

বিক্রম। খুঁজে দেখুন, সে নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে। যত দোষ ঐ কেরামতের। মেয়েটা যখন সম্রাটের নজরে পড়েছে, তখন নিশ্চয় তার বরাত ফিরে যাবে।

রেজা। মেহেরকে আপনি দেখেছেন?

বিক্রম। দেখিনি মানে? দিনরাত তো ঐ কেরামতের সংগে সে আমার বাড়ীতে পড়ে থাকতো।

রেজা। একটা চাষীর মেয়ের এত রূপ হলো কি করে?

বিক্রম। আমিও তো তাই ভাবছি খাঁ সাহেব। রূপ তো নয় যেন আলো। অন্ধকারে বসে থাকলেও যেন গা দিয়ে জ্যোতি ঠিকরে বেরোয়।

রেজা। রায় মশায়।

বিক্রম। বেটী মুসলমান না হলে এই বিক্রমজিৎ রায় চতুর্থ পক্ষেও তার পাণিগ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হতো না।

রেজা। এত রূপ? মেহের—মেহের কে চাই—যেমন করেই হোক তাকে খুঁজে বার করতেই হবে।   [প্রস্থান।

বিক্রম। খাঁ সাহেবেরও দেখছি মেহেরের উপরে দরদ উথলে

উঠেছে! যাক, এখন ভালোয় ভালোয় বেটীকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যেতে পারলে মোটা বকশিস পাওয়া যাবে। হে মা দুর্গা, প্রসন্ন হও। সম্রাটের মনোরঞ্জন করে আমার গোয়ালিয়রের বুকে যেন কিছু করে নিতে পারি মা—কিছু করে নিতে পারি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

উন্মাদিনী ছায়া বেগমের প্রবেশ, তাহার চক্ষু কোটরগত, পরনে কালো পোষাক, রুক্ষ চুল।

ছায়া। দিন শেষ হয়ে গেল, রাত্রি এল? না রাত্রি শেষ হল, দিন এল? কিছু বোঝার উপায় নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ মুক্ত আশমানের তলে সুখে দিন কাটাচ্ছে,—আর আমি? যে আঁধারে সেই আঁধারে।

খাবারহস্তে বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। সেলাম হুজুরাইন।

ছায়া। কে? কে তুই?

বান্দা। আমি বান্দা।

ছায়া। কি চাস এখানে?

বান্দা। আপনার খাবার এনেছি—

ছায়া। খাবার? আমার খাবার কেন এনেছিস? ··বলতে পারিস বান্দা, মানুষ কেন খাবার খায়?

বান্দা। বাঁচার জন্যে হুজুরাইন।

ছায়া। কিন্তু আমি তো মরতেই চাই, তবে কি দরকার খাবার? যা, দূর হ এখান থেকে।

বান্দা। তিন দিন আপনি কিছু খাননি।

ছায়া। তাতে তোর কি? সেকেন্দার শার আদরের বেগম আমি—আজ আমার স্থান হয়েছে কারাগারে। রত্ন অলংকারের পরিবর্তে এক টুকরো ছেঁড়া কাপড়, রাজভোগের বিনিময়ে দুটো শাক-ভাত। কেন? কেন? যার স্বামী ছিল একদিন তামাম হিন্দুস্থানের সম্রাট, তার এদশা হবে কেন? ও কি! তবু দাঁড়িয়ে আছিস? যা—দূর হ। কোথা দিয়ে যেন কি হয়ে গেল। সেকেন্দার শা কবরে গেল, ইব্রাহিম লোদী পেলো মসনদ, আর আমার স্থান হলো কারাগারে। কেন? দিল্লীর বুকে কি আমার জন্য এমন একটু স্থান ছিল না, যেখানে এ বাঁদীর স্থান হয়?

বান্দার পুনঃ প্রবেশ।

বান্দা। বেগম সাহেবা।

ছায়া। চুপ। কে বেগম সাহেবা?

বান্দা। আপনি।

ছায়া। বেগম সাহেবা অনেকদিন আগে কবরে গেছে, আমি তার ছায়া। কেন বেঁচে আছি জানিস? ইব্রাহিম লোদীর মৃত্যু দেখার জন্য।

বান্দা। ও কথা বলবেন না বেগম সাহেবা, কেউ শুনতে পেলে—

ছায়া। হত্যা করবে, না? হা-হা-হা! সে ভয় আর আমার নেই বান্দা। চোখের সামনে থেকে যার দুনিয়ার আলো নিভে গেছে, জীবন্তে সে মৃতের মতই নিষ্প্রাণ। যা যা, এখান থেকে যা—

বান্দা। আপনি খাবার খেয়ে নিন বেগম সাহেবা।

ছায়া। ওই এক কথা—খাবার খেয়ে নিন। কিন্তু কেউ বলে না যে বাইরে যাও। বলতে পারিস বান্দা, দিল্লীর ঘরে ঘরে কি তেমনি আলো জ্বলে? তেমনি জনসমাগমে ভরে যায় দিল্লীর রাজপথ? তেমনি বসন্তে কোকিল ডাকে? বর্ষায় ময়ুর নাচে? বল বল, সব ঠিক আছে?

বান্দা। সব ঠিক আছে হুজুরাইন।

ছায়া। কেউ কাঁদে, কেউ হাসে। চমৎকার খোদার বিচার! একটা অনুরোধ রাখবি বান্দা?

বান্দা। বলুন।

ছায়া। একবার—শুধু একটিবার বাইরে নিয়ে যেতে পারিস?

বান্দা। না হুজুরাইন। আপনাকে ফটকের বাইরে নিয়ে গেলে জান দিতে হবে।

ছায়া। তবে যা, দূর হ এখান থেকে। এখানে আর আসিসনি।

বান্দা। সেলাম বেগম সাহেবা। [প্রস্থান।

ছায়া। বেগম সাহেবা। হা-হা-হা…কথা শুনে না হেসে থাকা যায় না। অনাহারে অনিদ্রায় অন্ধকূপে যে বন্দিনী হয়ে আছে, সে হচ্ছে বেগম সাহেবা?

চাবুকহস্তে রেজা খাঁর প্রবেশ।

রেজা। কেমন আছেন বেগম সাহেবা?

ছায়া। এই যে রেজা খাঁ। চাবুক এনেছো ?

রেজা। এনেছি বইকি।

ছায়া। তবে আর কি, মারো ; পিঠ তো পেতে রেখেছি। আজ ক ঘা ?

রেজা। দশ ঘা।

ছায়া। দিনের পর দিন তোমাদের চাবুকের হিসেবটা যেন কমে আসছে। ব্যাপার কি রেজা খাঁ ?

রেজা। জাঁহাপনার মর্জি।

ছায়া। নাও নাও, মারো। দেরী হলে তোমার মনিব আবার রাগ করবেন।

রেজা। [চাবুক প্রহার] এক—

ছায়া। [আর্তনাদ] আঃ—

রেজা। [প্রহার] এই দুই—

ছায়া। ওঃ—খোদা—

রেজা। এই তিন—[মারিতে উদ্যত]

ছুটিয়া আলম খাঁর প্রবেশ ও চাবুকসমেত তাহার হস্ত ধারণ।

আলম। চাবুক থামাও রেজা খাঁ, চাবুক থামাও।

রেজা। হুকুম নেই।

আলম। তোমার মনটা কি লোহা দিয়ে গড়া রেজা খাঁ ?

রেজা। আলম খাঁ—

আলম। মানুষ হয়ে আর একজন মানুষকে প্রতিদিন এমনি করে চাবুক মারতে তোমার অন্তর কি একটুও কেঁদে ওঠে না ?

রেজা। আমার কি অপরাধ আলম খাঁ! আমি নফর, মালিকের আদেশপালন করাই আমার কর্ত্তব্য।

ছায়া। ঠিক বলেছ বাবা। তোমার মত নফর দিল্লীতে আর কটা আছে বলতে পারো?

আলম। রেজা খাঁ, যে দাসত্বের বিনিময়ে নিজের মনুষ্যত্বকে বিলিয়ে দিতে হয়, সে দাসত্ব নাই বা করলে ভাই।

রেজা। খাবো কি?

আলম। শাক-ভাত। ভাত যদি না জোটে, মুঠো মুঠো করে মাটি খাওয়াও অনেক ভাল।

রেজা। কথাটা মুখে বলা যায়, কাজে করা যায় না আলম খাঁ।

আলম। চেষ্টা করে দেখ।

রেজা। ও সব বড় বড় কথা না বলে, তুমি সরে পড় আলম খাঁ। আমি আমার কাজ করি।

আলম। আলম খাঁ যখন এসেছে, আজ আর তোমাকে চাবুক মারতে দেবে না রেজা খাঁ। পথ দেখ--

রেজা। তুমি আমাকে বাধা দেবে?

আলম। দেবো।

ছায়া। না না, বাধা দিও না। ওকে ওর কাজ করতে দাও। ও নফর, ওর কি দোষ?

আলম। অন্যায় যে করে, তার চেয়ে বেশী অপরাধী সে, যে সেই অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয়। রেজা খাঁ। এখনও সময় আছে, ইব্রাহিম লোদীর দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত কর। তার জন্য যদি তোমাকে ভিক্ষা করেও খেতে হয়, সে হবে তোমার শান্তির।

রেজা। তুমি চিরদিন রাজপ্রাসাদের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছো

আলম খাঁ, সুতরাং দরিদ্রতার যে কি নির্মম আঘাত, তা তো তুমি জান না ।

আলম। হয়তো তাই। কিন্তু ভাই, ভেবে দেখ—পেটের জ্বালায় কি বিষ্ঠা মুখে তোলা যায় ?

রেজা। আলম খাঁ !

আলম। দরিদ্রতার জ্বালা সহ্যাতীত, কিন্তু সে জ্বালার উপশমের জন্য অন্যের কাছে নিজের মনুষ্যত্বকে বিক্রী করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় রেজা খাঁ। তাতে দরিদ্রতা ঘোচে সত্য, কিন্তু খোদার দয়া পাওয়া যায় না। যাও রেজা খাঁ, ফিরে যাও। আর যদি পারো, এই নারীর কাছে তোমার অপরাধের মাফ চেয়ে নাও।

রেজা। তা হবে না আলম খাঁ। রেজা খাঁ মরবে, তবু সম্রাটের কাছে বেইমানী করবে না।

আলম। বেইমান সম্রাটের সংগে বেইমানী করাই উচিৎ সিপাহশালার।

রেজা। খবরদার! আমার সম্রাটের নামে নিন্দাবাদ—এ আমার অসহ্য ।

আলম। সম্রাট তোমার একার নয়, সম্রাট আমারও।

রেজা। আমার কাজে বাধা দিলে মরতে হবে।

আলম। আমার কথা না শুনলে তোমাকেও মরতে হবে রেজা খাঁ।

রেজা। বেশ, তবে শক্তির পরীক্ষাটা হয়ে যাক্।

[উভয়ের যুদ্ধ]

ছায়া। একি করছো তোমরা ? আমার জন্য নিজেরা মারামারি

করছো ? না না, যুদ্ধ থামাও বাপু। চাবুক খাওয়া আমার অভ্যাস আছে।

[যুদ্ধে রেজা খাঁর পরাজয়]

আলম। যাও রেজা খাঁ; তোমার জোর নসীব যে, আলম খাঁর হাত থেকে তোমার শির বেঁচে গেল।

রেজা। এ অপমান রেজা খাঁও কোনদিন ভুলবে না আলম খাঁ।

[প্রস্থান।

আলম। আসুন মা, আপনাকে আমি কারার বাহিরে নিয়ে যাই।

ছায়া। না বাবা। সন্তানকে বিপদের মুখে ফেলে মা কোনদিন মুক্তি নিতে পারে না। কি নাম বললে তোমার ?

আলম। আলম খাঁ।

ছায়া। আলম খাঁ ? কিন্তু আর কোনদিন তো তোমাকে দেখিনি বাবা ?

আলম। আমি পাঞ্জাবে ছিলাম মা, আজ দুদিন হলো দিল্লীতে এসেছি।

ছায়া। আলম খাঁ—আলম খাঁ, যেন বহুদিন আগে এমনি একটি মুখ, এমনি দুটি ডাগর চোখ আমার বুকের মাঝে লুকিয়ে থাকতো ? না না, এ আমি কি বলছি ?

আলম। মা !

ছায়া। চুপ। আমি কারও মা নই। কোনদিন কারও মা ছিলাম না। আমার একমাত্র পরিচয় আমি বাঁদী। সেকেন্দার শার বাঁদী।

আলম। বাঁদী ! কিন্তু আপনাকে দেখে যেন মনে হয়—

ছায়া। কি ? কি মনে হয় ?

আলম। আপনি দিল্লীর কোন এক সম্ভ্রান্ত ইসলাম বংশীয় নারী। বলুন কে আপনি?

ছায়া। আমি সেকেন্দার শাহ আদবের বেগম।

আলম। বেগম সাহেবা! ভাবি, তোমার এ অবস্থা কেমন করে হলো?

ছায়া। আলম, তুই সেই আলম? যে একদিন আমার কোলে বসে আসমানের তারা গুণতো, দাঘির কালো জল দেখে হাসিতে ভরিয়ে তুলতো কোমল দুটি ঠোঁট—তুই সেই আলম?

আলম। ভাবি, বল ভাবি, তোমার এ অবস্থা কেমন করে হলো।

ছায়া। সবই খোদার ইচ্ছা। তোর দাদা কবরে গেল। ইব্রাহিম লোদী পেল হিন্দুস্থানের মসনদ। দুদিন পরে আমার হারেমে সংবাদ এল, আমার জন্য নাকি নূতন প্রাসাদ তৈরী করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো তাঞ্জাম; তাঞ্জামেও উঠলাম। যেখানে এসে নামলাম, দেখলাম সেটা প্রাসাদ নয়, কারাগার।

আলম। ভাবি!

ছায়া। বান্দা বাঁদী সবাইকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন আমাকে এখানে আনা হয়েছে? কেউ কথার উত্তর দিল না। কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালাম ইব্রাহিম লোদীর কাছে। উত্তর এল আমি তার পিতার বাঁদী; তাই আমার এই যোগ্য স্থান কারাগার। কত অনুরোধ করেছি, কত কেঁদে বলেছি—ওরে ইব্রাহিম, আমি হীরে জহরৎ চাই না—রাজপ্রাসাদ চাই না—মায়ের সম্মান তোর কাছে চাই না, তুই আমাকে দিল্লীর যে কোন স্থানে একখানা পাতার কুটীর নির্মাণ করিয়ে দে। আমি সেখানে আনন্দে বাস করবো। কিন্তু

কেউ শুনলো না আমার কথা। কত যুগ কেটে গেল এই অন্ধকার ঘরে। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেল, তবু প্রাণটা গেল না।

আলম। ভাবি, আজ আমি বুঝতে পেরেছি—তোমাকে কারারুদ্ধ করার জন্যই শয়তান ইব্রাহিম আমাকে জায়গীরের লোভ দেখিয়ে পাঞ্জাব পাঠিয়েছিল। এস ভাবি, আমি আজ এখনি তোমাকে মুক্তি দেবো।

ছায়া। না পাগল। আজ মুক্তি দিলে কাল ও আবার আমাকে বন্দী করবে, তোমাকেও জীবন দিতে হবে।

আলম। ওঃ, ইব্রাহিম! পাঞ্জাবে বসে আমি তোমার বিষয় যা শুনেছি, এখন দেখছি সত্যই তাই। পথের দুধারে দেখেছি অসংখ্য অন্ধ বিকলাঙ্গ মানুষের দল। তোমারই অত্যাচারে কারও পা নেই, কেউ হারিয়েছে তার দৃষ্টিশক্তি। আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি এই মুহূর্তে তোমার মত শয়তানকে মসনদ থেকে নামিয়ে নৃশংস ভাবে হত্যা করি।

ছায়া। ও সব কথা বলিসনি; তাহলে হয়তো সে তোর জিভ-টাকেই টেনে ছিঁড়ে ফেলবে। যা, প্রাসাদে যা।

আলম। যাচ্ছি ভাবি, তবে যাবার সময় আমি বলে যাচ্ছি, যেমন করে পারি আমি তোমাকে মুক্ত করবোই।

ছায়া। তাতে তোর জীবন বিপন্ন হবে আলম।

আলম। হোক। মায়ের উদ্ধারে যদি সন্তানের জীবন বিপন্ন হয়, তাতে আমার দুঃখ না হয়ে বরং আনন্দই হবে মা।

ছায়া। আলম খাঁ!

আলম। আলম খাঁ মরবে, তবু যার করুণায় সে মানুষ হয়েছে,

সেই মাতৃসমা ভাবীকে সে কারাগারে বন্দিনী হয়ে থাকতে দেবে না।

[প্রস্থান।

ছায়া। খোদা! একি তোমার লীলা! কেউ মারে চাবুক, কেউ দেয় সান্ত্বনা; কেউ ফেলে চোখের জল, কেউ হাসে অট্টহাসি; কেউ করে আর্তনাদ, কেউ দেয় জয়ধ্বনি। সবই তোমার মর্জি মেহেরবান, সবই তোমার মর্জি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ।

গীতকণ্ঠে মেহেরের প্রবেশ।

মেহের।—

গীত।

মিলন বাসর ভেঙে গেল মোর, শুকিল ফুলের মালা।
আশার স্বপন কেটে গেল হায়, দিয়ে গেল শুধু জ্বালা॥
কত নিশি জাগি গিয়াছে চলি
যার স্মৃতি স্মরি কেঁদেছি উছলি,
নয়নের জলে যে ফুল ফুটিল হলো না তাহে ভরা সে ডালা॥

[উদয়ের প্রবেশ।

উদয়। মেহেরদি!

মেহের। কি উদয় ?

উদয়। তুমি তো বেশ গান গাইতে পার ?

মেহের। এ আবার বেশ ?

উদয়। আচ্ছা মেহেরদি, তোমার দেশে কে কে ছিল ?

মেহের। কেউ না। শুধু ভাঙা একখানা বাড়ী, পচা একটা পুকুর, আর বাজ পড়া একটা তালগাছ।

উদয়। বাড়ীর জন্য তোমার মন কাঁদে না ?

মেহের। কাঁদে ভাই। কিন্তু কি করবো, উপায় নেই।

উদয়। মেহেরদি, তুমি যুদ্ধ করতে জান ?

মেহের। না ভাই, মেয়েছেলের কি যুদ্ধ করতে আছে ?

উদয়। কেন থাকবে না ? তোমাকে এবার থেকে যুদ্ধ করা শিখতে হবে।

মেহের। কার কাছে ?

উদয়। কেন, আমার কাছে। ধর তলোয়ার।

মেহের। সে কি ?

উদয়। কোন কথা নয়, ধর তলোয়ার।

মেহের। আরে, মেয়েছেলে যুদ্ধ করবে কি ?

উদয়। নিশ্চয় করবে। তলোয়ার ধর, নইলে দিলুম প্যাঁচ- গেল গর্দ্দান। [তলোয়ারে প্যাঁচ দেখাইল]

মেহের। ওরে বাবারে, কে আছ কোথায়, রক্ষা কর—

কর্ণদেবীর প্রবেশ

কর্ণ। উদয়—উদয়—

উদয়। মা !

কর্ণ। একি হচ্ছে দস্যি ছেলে ?

উদয়। মেহেরদিকে যুদ্ধ করা শেখাচ্ছি।

মেহের। এই দেখুন না মা, এখনি উদয় আমাকে দুটুকরো করে ফেলেছিল।

কর্ণ। ছি বাবা, এসব কি ?

উদয়। তুমি কিছু বোঝ না মা। বাবা বলেছে—মেবারের ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাইকে যুদ্ধ শিখতে হবে।

কর্ণ। যেমন বাপ তেমনি তার ছেলে। যাও, তলোয়ার রেখে এস।

উদয়। রেখে এলেই হলো! দেখবে মা কেমন প্যাচ শিখেছি ?

কর্ণ। না, আর প্যাচ দেখাতে হবে না, পাঠশালায় যাবার সময় হয়েছে।

উদয়। পাঠশালায় আমি আর যাবে না মা।

কর্ণ। উদয় !

উদয়। আজ থেকেই যুদ্ধের পাঠশালায় আমি যুদ্ধ শিখবো মা।

কর্ণ। কি বলছিস তুই ?

উদয়। ঠিকই বলছি মা! দেশের স্বাধীনতা বজায় রাখতে গেলে শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় পেট ভরালেই চলবে না মা।

কর্ণ। উদয় !

উদয়। অস্ত্রবিদ্যাও শিখতে হবে। দেশ যদি পাঠানের পায়ে বিকিয়ে যায়, তবে কে বুঝবে শিক্ষার মহত্ত্ব। কে দেবে আমায় পাণ্ডিত্যের সম্মান ?

কর্ণ। এরা সবাই মিলে ছেলেটাকে পাগল করবে।

উদয়। আশীর্বাদ কর মা, এমনি পাগলেই যেন ভরে যায়

সোনার ভারত। আমরা যেন দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারি মা। তুচ্ছ প্রাণের মায়ায় যেন দেশকে না হারাই।

[প্রস্থান।

কর্ণ। মনে হয় ঝড় উঠবে, এ তারই পূর্বাভাষ।

মেহের। মা,—

কর্ণ। তোর বাবা এখনও ফিরে এল না মেহের?

মেহের। না মা, আজ সাত দিন হলো।

কর্ণ। তাইতো মা, বড় চিন্তার কথা। বলা যায় না—ইব্রাহিম লোদী তো মানুষ নয়, যদি সে তোর বাবাকে—

মেহের। মা!

কর্ণ। ভয় কি মা? যদি তাই হয়, মহারাণা নিশ্চয় তাকে উদ্ধার করে আনবেন। আশ্রিতের জন্য জীবন দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হবেন না।

মেহের। সবই বুঝি মা। তবু মনটা কেঁদে ওঠে। ছেলে বেলায় মাকে হারিয়ে বাবার কোলেই মানুষ হয়েছি। আজ আমার রূপের জন্য বাবাকে যদি প্রাণ দিতে হয়, তাহলে এজীবন আর আমি রাখবো না মা।

কর্ণ। দূর পাগলী। অত দুর্বল হলে চলবে কেন, আমরা ভারতের নারী, এক হাতে শত্রু নিধনের অস্ত্র আর অন্য হাতে বরাভয় নিয়েই আমাদের জন্ম। আমরা হয় শত্রুর মাথা নেবো, নয় নিজেদের মাথা দেবো।

মেহের। মেবারের মহারাণীর উপযুক্ত কথাই বলেছ তুমি মা। সারা ভারতে ঘুরেছি, কেউ আমাদের আশ্রয় দেয় নি, সবাই ইব্রাহিম লোদীর নামে আতংকে শিউরে উঠেছে। কিন্তু এখানে এসে

মহারাণার পায়ে আশ্রয় পেয়েছি। আজ বুঝেছি মা, সারা ভারতে সিংহের দেশ একমাত্র রাজস্থান, বাকী সব শিয়ালের দল।

নেপথ্যে। জয়—মেবারের জয়।

কর্ণ। ওই মহারাণা ফিরে এলেন পাঞ্জাব থেকে। তুই যা মা, আমি মহারাণার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিগে।

মেহের। যাচ্ছি মা।

[প্রস্থান।

কর্ণ। ওগো দেবী মেবারেশ্বরী! তুমি মেবারের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখো মা, মেবারের বিজয়-নিশান যেন কখনও পাঠানের পদতলে নমিত না হয়।

সংগ্রাম সিংহের প্রবেশ।

সংগ্রাম। মেবারের বিজয়-নিশান চিরউড্ডীন থাকবে, কেউ তাকে নমিত করতে পারবে না দেবী।

কর্ণ। সংবাদ কি মহারাণা?

সংগ্রাম। সংবাদ শুভ। ইব্রাহিম লোদীর অত্যাচারে পাঠান আমীর ওমরাহগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। আসন্ন যুদ্ধে তাঁরা আমাকেই সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কর্ণ। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী?

সংগ্রাম। তিনিও আমাকে সমর্থন করেছেন মহারাণী।

কর্ণ। দৌলত খাঁ পাঠান হয়ে পাঠানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে?

সংগ্রাম। দিল্লীর সম্রাট দৌলত খাঁর স্বজাতি হলেও তার অত্যাচারের নৃশংস কাহিনী শুনে পাঞ্জাব-সুবেদার অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন; তাই তিনি চান ইব্রাহিমকে গদীচ্যুত করতে।

কর্ণ। কিন্তু ইব্রাহিম লোদীর বিশাল সৈন্যবাহিনীর সামনে আমাদের ক্ষুদ্র সেনাদল কেমন করে অস্ত্র ধরবে মহারাণা ?

সংগ্রাম। সে চিন্তা করার সময় এখন নয় কর্ণদেবী। ভবিষ্যতের আশংকায় বর্তমানে পেছিয়ে আসা চলে না। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছে। তবে পরাজয়ের চিন্তায় অন্যায়ের কাছে মাথা নীচু করা সম্ভব নয়।

কর্ণ। আমি তা বলছি না মহারাণা।

সংগ্রাম। তবে পাঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছি বলে তোমার ভয় হচ্ছে কর্ণদেবী ?

কর্ণ। ভয় ? মহারাণা, আমি রাজপুত নারী। স্বামীর সংগে একই চিতায় জীবন্ত দেহে যারা মৃত্যুকে বরণ করে, শত্রুনিধনে একমাত্র সন্তানকেও যারা হাসতে হাসতে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দেয়, ভয় কাকে বলে তারা জানে না স্বামী। ধর তুমি অস্ত্র পাঠানের বিরুদ্ধে, কর তুমি অভিযান বিদেশীর উচ্ছেদ সাধনে, দেশের সকলের জন্য—তোমার মংগলের জন্য মেবারের মহারাণী আমি, প্রয়োজন হলে শাণিত কৃপাণ হাতে নিয়ে মাভৈঃ রবে আমিও ছুটে যাবো রণক্ষেত্রে শত্রুর রক্তে মেবারের মাটি রাঙা করে দিতে।

[প্রস্থান।

সংগ্রাম। জাগো, জাগো কর্ণদেবী। তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জেগে উঠুক অগণিত মেবারের মা-ভগ্নীর দল।

নেপথ্যে। জয় মেবারেশ্বর রাণা সংগ্রাম সিংহের জয়।

সংগ্রাম। মেবার—মেবার—মেবার আমার ধ্যান, মেবার আমার জ্ঞান। মেবারের গৌরব আমার গৌরব। মেবারের স্বাধীনতা আমার জীবনের একমাত্র কাম্য।

রহমৎকে লইয়া তেজসিংহের প্রবেশ।

তেজ। মহারাণার জয় হোক।

সংগ্রাম। সংবাদ কি তেজসিংহ?

তেজ। প্রভু! এই শয়তান আমাদের রাজস্ব না দিয়ে উল্টে দেওয়ানকে অপমান করেছে।

সংগ্রাম। কেন যুবক, তুমি আমার রাজস্ব বন্ধ করেছো?

রহমৎ। যে রাজা প্রজার ধনমান রক্ষা করতে পারে না, রাজস্ব চাইতে তার লজ্জা হওয়া উচিত।

তেজ। মুখ সামলে কথা বল রহমৎ।

সংগ্রাম। বাধা দিও না তেজসিংহ, বলতে দাও। বল যুবক, আর কি তোমার বলার আছে? আমি তো জানি আমার রাজ্যে প্রজারা শান্তিতে বাস করছে।

রহমৎ। না মহারাণা, এ আপনার ভুল ধারণা। মাত্র তিন দিন আগে পাঠান-সৈন্যের হাতে আমার স্ত্রী প্রাণ দিয়েছে।

সংগ্রাম। যুবক!

রহমৎ। আমার ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই আমি আপনার দেওয়ানকে সাফ জানিয়ে দিয়েছি যে, রাজস্ব আমি দেবো না।

তেজ। এই বিদ্রোহী প্রজাকে বন্দী করতে আদেশ দিন মহারাণা।

সংগ্রাম। শুধু বন্দী নয় তেজসিংহ, এই বিদ্রোহীকে আরও গুরুদণ্ড দিতে হবে।

রহমৎ। মহারাণা, আমি জানি—আপনি আমাদের মত

দুর্বলকেই চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে জানেন, প্রবল শত্রুকে বাধা দেবার শক্তি আপনার নেই।

সংগ্রাম। তুমি আমার কাছে মাথা নীচু করবে না যুবক?

রহমৎ। মাথা নীচু করবো তার কাছে—যে আমার দেশের শত্রুর বুকে দাঁত বসিয়ে দিতে পারবে; আপনার মত কাপুরুষের কাছে নয়।

তেজ। আদেশ দিন মহারাণা, একে মৃত্যুদণ্ড দিই।

সংগ্রাম। ঠিক বলেছো তেজসিংহ, মৃত্যুদণ্ডই দেবো। তবে একে নয়, তোমাকে।

তেজ। মহারাণা!

সংগ্রাম। চমকে উঠলে কেন বন্ধু? মহারাণা সংগ্রাম সিংহের কাছে তোমার মত অযোগ্য সেনাপতির ক্ষমা নেই।

তেজ। আমার অপরাধ কি মহারাণা?

সংগ্রাম। অপরাধ গুরুতর তেজসিংহ। রাজ্যরক্ষার দায়িত্ব তোমাদের উপর দিয়েছি, সে কর্তব্য কতটুকু পালন করেছো তুমি? তোমার মত বীর সেনাপতি যার, তার রাজ্যে পাঠান-সৈন্যের হাতে আমার প্রজাদের কেন অত্যাচার সইতে হয়? রাজস্বের জন্য যাকে পীড়ন করে বন্দী করে এনেছো, তার প্রাণ, মান রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা করেছিলে তেজসিংহ?

তেজ। মহারাণা! সীমান্তে পাঠান-উপদ্রব বন্ধ করার জন্য দায়ী আমি নই। সেজন্য দায়ী সীমান্তরক্ষীর দল।

সংগ্রাম। সীমান্তরক্ষীদলের অকর্মণ্যতার জন্য তুমিই তো দায়ী তেজসিংহ। আজ পাঠানরা আমার প্রজার উপর অত্যাচার করেছে, কাল হানা দেবে রাজধানীর বুকে।

তেজ। মহারাণা, এবারের মত আমায় ক্ষমা করুন। আমি

আপনার কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—মেবারের গৌরবরক্ষায় আমি জীবন দেবো।

রহমৎ। মেবারের রাণা এত মহৎ! আপনি আমায় দণ্ড দিন সম্রাট।

সংগ্রাম। তোমার দণ্ড? হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি রাজস্ব না দিয়ে গুরুতর অপরাধ করেছো। তাই তোমাকে এমন দণ্ড দেবো—যা শুনে সবাই চম্‌কে উঠবে।

রহমৎ। মহারাণা!

সংগ্রাম। তোমার একমাত্র দণ্ড অস্ত্রাঘাত।

রহমৎ। অস্ত্রাঘাত?

সংগ্রাম। হ্যাঁ, অস্ত্রাঘাত। তবে তোমার বুকে নয়। তোমার দেশের শত্রু যারা, তাদের বুকে অস্ত্রাঘাত করার অধিকার দিলাম তোমায়। ধর বীর, মহারাণার এই শাণিত কৃপাণ। [অস্ত্র দান ও রহমতের অস্ত্র গ্রহণ] আশাকরি এর মর্য্যাদা তুমি রাখতে পারবে।

তেজ। কিন্তু মহারাণা, ও যে মুসলমান।

সংগ্রাম। মুসলমান হলেও ও যে ভারতবাসী। ভারতের মুচি, মেথর, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হিন্দু, মুসলমান আমার ভাই, তারাই আমার প্রাণ।

সহসা গীতকণ্ঠে ফকির সাহেব প্রবেশ করিয়া
সংগ্রাম সিংহ ও রহমতের হাতে হাত
মিলাইয়া দিলেন।

ফকির।—   গীত।

এমনি করে বাঁধা থাকিস স্নেহডোরে ভাই-ভাই
আঁধার রাতি যাবে কেটে, পাবি আলোকের রোশনাই।

সবুজ বনের লতায় পাতায়
একই মাটির এই দুনিয়ায়
ধর্মে হয়েও হিন্দু মুসলমান ভাবিস শুধু তোরা মানুষ সবাই।

। প্রস্থান।

রহমৎ। মহারাণা, আমি এ দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ অক্ষম। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

সংগ্রাম। মহারাণা সংগ্রাম সিংহ মানুষ চেনে বন্ধু। সে জানে ছাই চাপা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুমি। তাই তো তোমার হাতে তুলে দিয়েছে তার দেশের স্বাধীনতারক্ষার ভার।

রহমৎ। জয় মহারাণা সংগ্রাম সিংহের জয়।

। বিক্রমজিৎ রায়ের প্রবেশ।

বিক্রম। জয় মহারাণা সংগ্রাম সিংহের জয়।

সংগ্রাম। একি! কে আপনি?

তেজ। ইনি দিল্লীশ্বরের দেওয়ান বিক্রমজিৎ রায়।

সংগ্রাম। নাম শুনে সুখী হলাম।

বিক্রম। নিশ্চয় সুখী হবেন। শ্রীযুত বিক্রমজিৎ রায়ের নাম শুনে সবাই সুখী হয় মহারাণা।

সংগ্রাম। আপনার এখানে কি প্রয়োজন?

বিক্রম। বলছি মশায়, বলছি। এতদূর থেকে এলাম, একটু বসি—বিশ্রাম করি, তারপর সব খুলে বলছি।

তেজ। বেশীক্ষণ আপনি এখানে থাকলে প্রাসাদ অপবিত্র হবে। যা বলার আছে বলে বিদেয় হন।

বিক্রম। কি রকম ভদ্রলোক মশায় আপনারা? আমি আপনার স্বজাতি—বাড়ীতে এলাম, একটু আদর আপ্যায়ন তো করতে হয়।

সংগ্রাম। তেজসিংহ, একটা চাবুক নিয়ে এস তো, ভদ্রলোককে একটু ভালরকম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করি।

বিক্রম। কি বলছেন মহারাণা! আমি সুলতানের দেওয়ান।

সংগ্রাম। তাইতো চাবুক মেরে তোমাকে অভ্যর্থনা করছি।

বিক্রম। আরো আমি যে তোমাদের স্বজাতি।

সংগ্রাম। স্বজাত বলেই তো তোমার কানটা বেঁচে গেল।

বিক্রম। কি? বিক্রমজিৎ রায়ের অপমান? লংকাকাণ্ড করবো—কুরুক্ষেত্র বাধাবো—আমাদের অপমান? আমি ভারতসম্রাটের দেওয়ান।

সংগ্রাম। এটা রাণা সংগ্রাম সিংহের প্রাসাদ কক্ষ। ভুলে যেও না—সংগ্রাম সিংহকে যে রক্তচক্ষু দেখায়, তার কাঁধে মাথা থাকে না। কি বলতে এসেছো বলে বিদেয় হও।

বিক্রম। পাঠানসম্রাট ইব্রাহিম লোদী তোমাকে জানিয়েছে, তুমি যদি তার বশ্যতা স্বীকার না কর—

সংগ্রাম। সিংহকে এত সহজে বশ্যতা স্বীকার করানো যায় না রায় মশাই! যাও, বল গিয়ে তোমার সুলতানকে—মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ একবার যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, তখন প্রাণ থাকতে সে স্বাধীনতা পাঠানের পায়ে বিলিয়ে দেবে না।

বিক্রম। বেশ। একে বিক্রমজিৎ রায়কে গালাগাল দেওয়া, তার উপর সম্রাটের বিদ্রোহিতা—মরণ, এইবার তোমার নির্ঘাত মরণ।

সংগ্রাম। সাবধান পশু! বেশী উত্যক্ত করলে—[গলা টিপিয়া ধরিল।]

বিক্রম। উ-হু-হু, গেছিরে বাবা, গেছি। ছাড়, গলা ছাড় বলছি সংগ্রাম সিংহ, নইলে ভাল হবে না তা বলে দিচ্ছি।

সংগ্রাম। কি করবে ?

বিক্রম। পালিয়ে যাবো। একছুটে বাঘের মত স্বস্থানে প্রস্থান করবো।

সংগ্রাম। যাও, দূর হও।

বিক্রম। যাচ্ছি—তবে তুমিও তৈরী থেকো। তিন দিনের মধ্যেই যদি পাঠানসৈন্য মেরে না আনতে পারি, তাহলে আমার নাম বিক্রমজিৎ রায় নয়—হঁা।

[বীরের মত প্রস্থান।

সংগ্রাম। রহমৎ !

রহমৎ। কি হুকুম মালিক ?

সংগ্রাম। আজ থেকে তোমাকে আমি আমার পাঁচ হাজার মুসলমান সৈন্যের সেনাপতি করে দিলাম।

রহমৎ। মালিকের হুকুম তামিল করতে এই রহমৎ হাসতে হাসতে জীবন দেবে, তবু বিদেশী পাঠানের পায়ে নতি স্বীকার করবে না। যাদের অত্যাচারে আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমান ভাই-বোন পুত্রহারা স্বামীহারা হয়ে চোখের জল ফেলছে, আজ থেকে মালিকের দেওয়া এ তলোয়ার রহমৎ তাদের বুকে বসিয়ে দেবে, না হয় হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করে নেবে।

সংগ্রাম। তেজসিংহ ! মনে রেখো, যে অপরাধ তুমি করেছিলে, দ্বিতীয়বার তার মার্জনা নেই। যাও, সৈন্যদের তৈরী হবার আদেশ জানাও।

তেজ। মহারাণার আদেশ শিরোধার্য। [প্রস্থান।

রহমৎ। মহারাণা, পাঠানসৈন্যদের কি আমরাই আগে আক্রমণ করবো ?

সংগ্রাম। না; আমরা আক্রমণ প্রতিহত করবো। মেবারের স্বাধীনতা ইব্রাহিম লোদী সইতে পারবে না বন্ধু। আমার মনে হচ্ছে, অবিলম্বে সে পাঠানসৈন্য নিয়ে আমার সাধের মেবারের বুকে ঝড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে—যাতে বাদশাহী সৈন্যের পদচাপে আমার সোনার মেবার শ্মশানে পরিণত না হয়।

রহমৎ। তাই হবে মালিক! আপনার দেওয়া এই অস্ত্রের মর্যাদা রাখতে আজ থেকে রহমৎ তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিহত করবে তার দেশের শত্রুকে। তার অধীনস্থ আপনার দেওয়া মুসলমান-সৈন্যের হাত ধরে ছুটে যাবে সে রণস্থলে; পাঠান-সৈন্যের হাতে আপনার ওই গর্বোন্নত শির লুণ্ঠিত হবার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়বে মাটির বুকে রক্তনেশায় মাতাল হয়ে।

[প্রস্থান।

সংগ্রাম। না না, তা হবে না—হতে পারে না রহমৎ! আমার কৈশোরের কল্পনা, যৌবনের স্বপ্ন, যুগ-যুগান্তরের সাধনা আজ বাস্তবের অরুণালোকে উদ্ভাসিত। আসুক পাঠান, বাধুক সংগ্রাম, বাজুক বিজয় গর্বে রণভেরী। তবু মহারাণা সংগ্রাম সিংহের এই স্বাধীনতার উদ্দাম উচ্ছ্বাসকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

রংমহল।

বাঈজীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল, ইব্রাহিম লোদী পালংকে অর্দ্ধশায়িত থাকিয়া সরাবপান করিতেছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ক্রূর ও মুখে নিষ্ঠুর হাসি। নৃত্যগীতের মাঝে হর্ষোক্তি করিতেছিলেন—"বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা।"

বাঈজীগণ।—

গীত।

রাতের অতিথি ওগো, কয়ো না কথা।
নীরবে বাসর জাগি জানাও ব্যথা॥
তন্দ্রা আসে যদি অলস আঁখিতে,
ঘুমাও প্রিয় তুমি ফুল-বিছানাতে,
মধুর অধরে চুম্বন পরশে জানাও মনের কথা॥

[গীতান্তে বাঈজীগণ কুর্নিশ করিয়া দাঁড়াইল]

ইব্রাহিম। এই বান্দা,—

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। [কুর্নিশ করতঃ] জাঁহাপনা!

ইব্রাহিম। এরা কোন্ দেশের ?

বান্দা। কাশ্মীরের জনাব!

ইব্রাহিম। ও—এরা তাহলে কাশ্মীরী হুরী? বেশ—বেশ—

বাঈজীগণ। জনাব! আমাদের বখশিস?

ইব্রাহিম। জরুর মিলেগা। এই বান্দা! যা—এদের নিয়ে যা, বখশিস দিয়ে এদের বিদায় করবি।

বান্দা। কি বখশিস দেবো জনাব? আসারফি?

ইব্রাহিম। না।

বান্দা। বস্ত্রহার?

ইব্রাহিম। না।

বান্দা। তবে কি দেবো জনাব?

ইব্রাহিম। মৃত্যু।

বাঈজীগণ। [সভয়ে] জনাব!

ইব্রাহিম। [নিষ্ঠুর হাসি] হা-হা-হা! তোমাদের নাচে গানে আমাকে মুগ্ধ করেছো, তাই তোমাদেব উপর সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের আমি বেহেস্তে পাঠিয়ে দিচ্ছি। হা-হা-হা।

বাঈজীগণ। জাঁহাপনা! আমরা বখশিস চাই না। আপনি আমাদের প্রাণভিক্ষা দিন।

ইব্রাহিম। আফশোষ করছো কেন? তুদিন পরে তোমাদের মত নাচনেওয়ালীদের তো ভিক্ষা করে খেতে হবে। তখন তোমাদের দেখে সবাই তামাসা করে বলবে, এরাই একদিন ইব্রাহিম লোদীর খাস বাঈজী ছিল। সে অপমান আমি সইতে পারবো না। তাই আগে থেকেই তোমাদের সরিয়ে দিচ্ছি। যা বান্দা, এদের নিয়ে যা—

বান্দা। আর কত হত্যা করবেন জনাব? লক্ষ লক্ষ নাচনে-ওয়ালী এল আর কোতলখানায় জীবন দিল। এত রক্ত দেখেও কি আপনার রক্ত দেখার নেশা কাটেনি?

ইব্রাহিম। চোপরাও কমবক্ত! হুকুম তামিল কর্।

বান্দা। যো হুকুম খোদাবন্দ! এসো কাশ্মীরী হুরীরা।

বাঈজীগণ। খোদা! এই অত্যাচারের বিচার তুমিই কর মেহের-বান, তুমিই কর।

[বান্দা সহ প্রস্থান।

ইব্রাহিম। খোদা! কে খোদা? খোদা এই ইব্রাহিম লোদী। যার ইচ্ছায় দশটা মাথা কাঁধ থেকে নেমে যায়, সেই তো দুনিয়ার মালিক।

আলম খাঁর প্রবেশ।

আলম। না সুলতান! যার ইচ্ছায় দশটা মাথা গজায়, সেই দুনিয়ার মালিক।

ইব্রাহিম। আলম খাঁ! তুমি আবার বেসুরো গাইছো কেন?

আলম। দিল্লীতে এসে সুর যে হারিয়ে ফেলেছি সুলতান!

ইব্রাহিম। কেন? দিল্লীতে আবার এমন কি দেখলে, যাতে তোমার সুর হারিয়ে গেল?

আলম। দিল্লীতে যা দেখলাম, তা কোন যুগে কোন দেশের কোন মানুষের নসীবে হয় না সুলতান!

ইব্রাহিম। যেমন?

আলম। দিল্লীর দিকে দিকে আজ নারীনির্য্যাতন, প্রজাপীড়ন শোকার্ত্ত মুমূর্ষু নর-নারীর আকুল ক্রন্দন। গ্রামের পর গ্রাম

জনশূন্য কবরস্থানে পরিণত হয়েছে। সবাই আজ আপনার নামে ঘৃণায় আতংকে মুখ ঢেকে চলে যাচ্ছে। বলুন সুলতান, কোটী কোটী মানুষের দণ্ডমুণ্ডের ভার হাতে নিয়ে যে মসনদে আপনি বসেছেন, তার কতটুকু দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন ?

ইব্রাহিম। আলম খাঁ! ইব্রাহিম লোদী কারও কাছে তার কাজের কৈফিয়ৎ দেবে না। সে ভারতের মসনদে বসেছে তার খেয়াল চরিতার্থ করতে।

আলম। ভারতের মসনদ খেলার পুতুল নয় সুলতান। ভারত-বাসীর জীবন মরণ নির্ভর করছে যার শাসন-শৃংখলার উপর, সেই মসনদে বসে আপনি যদি খেযাল চরিতার্থ করতে চান, তাহলে আমরা আপনাকে অযোগ্য সুলতান বলে ঘোষণা করবো। প্রয়োজন হলে মসনদ থেকে আপনাকে সরিয়ে দিতেও কুণ্ঠীত হবো না।

ইব্রাহিম। কিন্তু ভুলে যেও না আলম খাঁ! তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো।

আলম। আমি যে আমার এক অযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছি—একথা ভুলিনি ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম। বয়সে তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট আলম খাঁ; তাই পিতৃব্যের সম্মান দাবী করা তোমার অন্যায়। তা ছাড়া আমি স্বীকার করি না যে, তুমি আমার পিতার কনিষ্ঠ সহোদর।

আলম। তোমার স্বীকার না করায় আলম খাঁর কিছু যায় আসে না। আমি জানতে চাই—ছায়া বেগমকে কারারুদ্ধ করেছো তোমার কোন্ সাহসে ?

ইব্রাহিম। আলম খাঁ! বেশী বাড়বাড়ি করলে মাথাটাই তোমার উড়ে যাবে।

আলম। মাথার ভয় আমার কোন কালেই ছিল না, আজও নেই সুলতান। সুলতানী রক্ত আমার দেহেও আছে, বাদশাহী তক্ত আমার নসীবেও জুটতো।

ইব্রাহিম। আলম খাঁ!

আলম। ছায়া বেগমকে মুক্তি দাও—

ইব্রাহিম। দেবো না।

আলম। ইব্রাহিম লোদী!

ইব্রাহিম। আলম খাঁ!

আলম। ফেরো ইব্রাহিম, ফেরো। এ্যায়সা দিন কভি নেহি রহেগা। আজ তোমার অত্যাচারে যারা কাঁদছে, কাল তারা তোমার মৃত্যু দেখে হাসবে।

ইব্রাহিম। তামাম হিন্দুস্থান যেদিন কবরে পরিণত হবে, সেদিন হয়তো ইব্রাহিম লোদীর মৃত্যু আসতে পারে—তার পূর্বে নয়।

আলম। হিন্দুস্থান কবরে পরিণত হবে না শয়তান; হিন্দুস্থানের মাটীতেই রচিত হবে তোমার কবর। ওই শোন, মুক্ত আশমানের তলে মুমূর্ষু জনগণ কাতর কণ্ঠে করছে আর্তনাদ। ওই দেখ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রোষবহ্নি সশব্দে ছুটে আসছে তোমার দিকে। সাবধান হও অত্যাচারী! নতুবা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তোমার শান্তিকুঞ্জ, তখন চোখের জলে সাগর সৃষ্টি করলেও, যা যাবে তা আর ফিরে আসবে না।

[প্রস্থান।

ইব্রাহিম। ইব্রাহিম লোদীর বিদ্রোহিতা করলে, জালাল খানের মত তোমাকেও একদিন কবরে যেতে হবে শয়তান!

দৌলত খাঁর প্রবেশ।

দৌলত। বন্দেগী সুলতান!

ইব্রাহিম। কি সংবাদ পাঞ্জাব সুবেদার? হঠাৎ তোমার দিল্লী আসার কারণ কি?

দৌলত। এসব কি শুনছি সুলতান?

ইব্রাহিম। তুমি আবার কি শুনলে দোস্ত?

দৌলত। আপনি নাকি দিল্লীর প্রাচীন আমীর ওমরাহদের উপর নির্যাতন করেছেন?

ইব্রাহিম। যথা?

দৌলত। কাউকে আপনি জায়গীরচ্যুত করেছেন, কাউকে প্রকাশ্য রাজপথে বেত্রাঘাত করেছেন, কাউকে বা আজীবন কারারুদ্ধ করে রেখেছেন। একি সত্য জাঁহাপনা?

ইব্রাহিম। হ্যাঁ, সত্য। তারা আমার বিদ্রোহী, তাই তাদের আমি চরম দণ্ড দিয়েছি।

দৌলত। ভুল করেছেন জাঁহাপনা! দিল্লীর আমীর ওমরাহগণ আপনার স্বজাতি পাঠান। তাদের উপর এভাবে নির্যাতন করলে, পাঠান সাম্রাজ্যের ভিত্তি আলগা হয়ে যাবে সুলতান! আপনি তাদের ফিরিয়ে আনুন।

ইব্রাহিম। কারও উপদেশে ইব্রাহিম লোদী চলে না দৌলত খান্।

দৌলত। সাম্রাজ্যের মংগলের জন্যও না?

ইব্রাহিম। সম্রাজ্যের মংগল আমার চেয়ে আর কেউ বেশী বোঝে না।

দৌলত। এ আপনার ভুল ধারণা।

ইব্রাহিম। দৌলত খান্! বেশী উত্ত্যক্ত করলে তোমাকে পাঞ্জাব হারাতে হবে।

দৌলত। ভেবে দেখুন সুলতান! আপনার পিতা সেকেন্দার শাহ্ আমীর ওমরাহদের যথেষ্ট সম্মান দিতেন।

ইব্রাহিম। পিতার কর্মপন্থা অবলম্বন করে ইব্রাহিম লোদী চলবে না মুর্খ! স্বয়ং খোদা এসেও যদি তার কানে পরামর্শ দেয়, তাও অগ্রাহ্য করে সে নিজের পথে এগিয়ে যাবে। যাও, ভবিষ্যতে আর আমাকে উপদেশ দিতে এসো না।

দৌলত। আমি বুঝতে পারছি, মহামতি সেকেন্দার শাহের উজ্জ্বল কীর্তি-গরিমা আপনার হাতেই ম্লান হয়ে যাবে। আরও বুঝতে পারছি--অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্থানের বুক থেকে পাঠানের গৌরব-রবি চির-অস্তমিত হবেই।

ইব্রাহিম। দৌলত খান্।

দৌলত। দিকে দিকে আজ বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। চেঙ্গিজ তৈমুরলঙের মত সুদূর কাবুলে বসে জহিরুদ্দীন মুহম্মদ বাবর দেখছে ভারত বিজয়ের স্বপ্ন। যে কোন মুহূর্তে পাঠানের ভাগ্যাকাশে ঝড় উঠতে পারে সুলতান! তাই এই বিপদেব দিনে আপনি যদি অগণিত হিন্দু-মুসলমানকে ভাই বলে কাছে টেনে না নেন, তাদের প্রাণ দিয়ে ভাল না বাসেন, তাহলে অচিরেই আপনার সুলতানীর স্বপ্ন পথের ধূলায় মিশে যাবে!

ইব্রাহিম। ইব্রাহিম লোদী দুর্বল নয়। যে কোন শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার সাহস তার আছে।

দৌলত। আপনার একক শক্তির কোন মূল্য নেই সুলতান! বুঝে

দেখুন, যেখানে মানুষ আপনার ধ্বংস চায়, সেখানে একা আপনি তৃণের মত তোপের মুখে উড়ে যাবেন।

[প্রস্থান।

ইব্রাহিম। বিদ্রোহী! বিদ্রোহী! উজীর আমীর সুবেদার আমি সবাইকে কোতল করবো।

রিজিয়ার প্রবেশ।

রিজিয়া। কাকে কোতল করছেন মেহেরবান?

ইব্রাহিম। এস রিজিয়া!

রিজিয়া। তোমাকে দেখে যেন খুব চঞ্চল বলে মনে হচ্ছে, কি হয়েছে সুলতান?

ইব্রাহিম। না, ও কিছু নয় বেগম! তোমাকে দেখলে আমার সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। রিজিয়া,—

রিজিয়া। সুলতান! হ্যাঁ, মেহেরকে তুমি বন্দী করেছো?

ইব্রাহিম। না বেগম! সে তার পিতার সঙ্গে দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

রিজিয়া। পালিয়ে গেছে?

ইব্রাহিম। হ্যাঁ।

রিজিয়া। ওঃ, রূপের খনি নিয়ে সে হিন্দুস্থানের বুকে বেঁচে থাকবে, আর আমি—

ইব্রাহিম। না, সে মরবে।

রিজিয়া। কেমন করে?

ইব্রাহিম। ইব্রাহিম লোদীর শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে সে কবরে গিয়েও নিস্তার পাবে না। আমি চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি। যেখানেই

সে থাক, তাকে বন্দিনী আমি করবোই। তারপর তার সেই রূপবহ্নিকে—

রিজিয়া। আমি নিজের হাতে দোজাকের অন্ধকারে পরিণত করবো। আমি দিল্লীর বেগম, আমার চেয়ে ওই চাষীর মেয়েটা হবে বেশী সুন্দরী? না—না, কিছুতেই না।

ইব্রাহিম। বেগম!

রিজিয়া। দিল্লী শহরে সুন্দরী বলতে থাকবে একমাত্র রিজিয়া। আর যে-কেউ রূপের খনি নিয়ে জন্মাবে, সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, তাকে হয় কুৎসিত কদযতা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে, না হয় দুনিয়া ছেড়ে সরে যেতে হবে।

ইব্রাহিম। তাই হবে রিজিয়া! তোমার মত সুন্দরী আর ইব্রাহিমের চেয়ে বুদ্ধিমান যে-কেউ জন্মাবে, আমি তাদের জীবন্ত কবর দেবো।

রিজিয়া। সাবাস্ সুলতান! তুমি হিন্দুস্থানের সুলতান। তুমি যা ইচ্ছা করবে তাই হবে।

ইব্রাহিম। হ—বে।

রিজিয়া। তুমি যদি চাও, আশমানের চাঁদ মাটীতে নেমে আসবে।

ইব্রাহিম। আসবে।

রিজিয়া। তোমার ইচ্ছায় দিন হবে রাত—রাত হবে দিন।

ইব্রাহিম। জরুর হবে।

রিজিয়া। দুনিয়ামে সব কই ঝুট, সাচ্ শুধু তুমি আর আমি।

ইব্রাহিম। আমি আর তুমি। [রিজিয়াকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিল]

রেজা খাঁর প্রবেশ।

রেজা। জাঁহাপনা! মেহেরের পিতা কেরামতকে আমরা বন্দী করেছি।

রিজিয়া। বন্দী করেছো? সাজা দাও সুলতান। সেই চাষী-টাকে হত্যা কর। আর মেয়েটার—

ইব্রাহিম। গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে তোমার পায়ের জুতি বানিয়ে দেব। কেমন?

রিজিয়া। জী হাঁ—

[প্রস্থান।

ইব্রাহিম। রেজা খাঁ! বন্দীকে এইখানেই নিয়ে এস।

রেজা। কই হ্যায়? বন্দী কেরামৎ—

বন্দী কেরামতকে লইয়া বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। বন্দী হাজির মেহেরবান!

ইব্রাহিম। এই বৃদ্ধের ঘরে অমন সুন্দরী হুরী এল কোথা থেকে রেজা খাঁ?

রেজা। আমিও তাই ভাবছি জনাব!

বান্দা। আমি কিন্তু ভেবে ঠিক করেছি জনাব!

রেজা। তুই আবার কি ঠিক করলি?

বান্দা। দেখুন, কালো গরুর পেট থেকে যদি সাদা বাছুর হতে পারে, তাহলে এই বুড়োর ঘরেই বা সুন্দরী মেয়ে হবে না কেন?

রেজা। আরে সে তো গরুর কথা।

বান্দা। ও মানুষ আর গরু একই কথা সেনাপতি মশাই।

ইব্রাহিম। সেকি ?

বান্দা। দুনিয়ায় যত মানুষ আছে, সবই কি মানুষ জনাব ? তার মধ্যে কিছু গরুও আছে।

ইব্রাহিম। হুঁশিয়ার কমবক্ত ! তোর মগজে দেখছি কিছুই নেই।

বান্দা। মগজে থাকলে কি আর এই খোষামুদে চাকরী করি জনাব !

রেজা। আমি তোকে হত্যা করবো বে-আদব !

ইব্রাহিম। থাক্ রেজা খাঁ ! ওর সঙ্গে বকে মাথা গরম করো না। [কেরামতকে] বল বৃদ্ধ ! কোথায় তোমার কন্যাকে লুকিযে রেখেছো ?

কেরামৎ। বলবো না।

ইব্রাহিম। না বললে প্রাণ দিতে হবে।

কেরামৎ। আমার প্রাণ দিয়েও আমার মেয়ের প্রাণ বাঁচাতে চাই সুলতান !

ইব্রাহিম। ভেবে দেখো। তোমার কন্যাকে আমি সাদী করে আমার হারেমের খাস বেগম করে নেব।

কেরামৎ। আমার মেয়েকে আমি একটা ভিখারীর সঙ্গে সাদী দিয়ে তার কুটিরের বাঁদী করে দেব, তবু তোমাব হারেমের বেগম হতে দেব না।

ইব্রাহিম। খবরদার কমবক্ত ! আমি তোর গায়ের চামড়া খুলে নেব।

কেরামৎ। তুমি বড়লোক, দেশের সুলতান। ইচ্ছা করলে তা পার।

ইব্রাহিম। সবই তো বুঝিস ! তবে মেয়েটাকে দিচ্ছিস না কেন ?

কেরামৎ। বুঝি বলেই দিচ্ছি না। ইব্রাহিম লোদী! তুমি নিষ্প্রাণ, তোমার বুকটা পাথর দিয়ে গড়া, তোমার চোখ দুটো দিয়ে ঠিকরে পড়ছে আগুন। ওই আগুনে কত মেয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তারা মরেও মরেনি নিষ্ঠুর, তোমার কোতলখানায় বসে সবাই কাঁদছে।

ইব্রাহিম। সাবধান বৃদ্ধ!

কেরামৎ। তোমার মাথা চিবিয়ে না খেয়ে তারা বেহেস্তে যাবে না শয়তান!

ইব্রাহিম। বান্দা! আমার তলোয়ার নিয়ে আয়—

বান্দা। আনছি জনাব! [প্রস্থান।

ইব্রাহিম। আমি তোকে কোতল করবো বৃদ্ধ!

কেরামৎ। মড়াকে চোখরাঙিয়ে কোন ফলই হবে না সুলতান। যেদিন থেকে তুমি নিয়েছো দেশের শাসনভার, সেদিনই আমাদের মত গরীবের প্রাণ দেহ ছেড়ে বেহেস্তে চলে গেছে।

ইব্রাহিম। তোর কন্যাকে দিবি না?

কেরামৎ। না—

ইব্রাহিম। কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছিস বলবি না?

কেরামৎ। না।

ইব্রাহিম। হত্যা কর রেজা খাঁ! হত্যা কর—

রেজা। মর্ তবে বেইমান! [রেজা খাঁ তরবারি লইয়া কেরামতকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইল]

সহসা ঝড়ের মত সংগ্রাম সিংহ আসিয়া বাধা দিলেন।
তাঁহার পরনে মুসলমান খানসামার পোষাক।

সংগ্রাম। সাবধান অত্যাচারী।

ইব্রাহিম। তুই ?

সংগ্রাম। এই বৃদ্ধের আশ্রয়দাতা !

রেজা। তোমার পরিচয় ?

সংগ্রাম। [ছদ্মবেশ উন্মোচন] আমি মহারাণা সংগ্রাম সিংহ ।

ইব্রাহিম। সংগ্রাম সিংহ ! হিন্দু—কাফের—

সংগ্রাম। এই হিন্দু কাফেরই আজ আশ্রয় দিয়েছে তার নির্যাতিত মুসলিম ভাইকে।

ইব্রাহিম। রেজা খাঁ ! সৈন্যদের ডাক, এই বিদ্রোহী শয়তানটাকে কবরে পাঠিয়ে দিক।

সংগ্রাম। সে পথ বন্ধ ইব্রাহিম লোদী ! তোমার প্রতিটি রক্ষী প্রহরীর পিছনে ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে আছে আমার সশস্ত্র সৈন্যগণ ; আপাততঃ তোমার আদেশ পালন করতে কেউ আসবে না।

রেজা। রেজা খাঁর হাতেই তোকে মরতে হবে।

সংগ্রাম। খবরদার রেজা খাঁ ! সিংহ এসেছে আজ দিল্লীর বুকে। তোমাদের মত শিয়ালের দল তার সামনে আস্ফালন করলে মরবে। চললাম সুলতান ! আমার আশ্রিত ভাইকে উদ্ধার করে নিয়ে। আদাব—

ইব্রাহিম। [অধৈর্য হইয়া] বিদ্রোহী কাফের !

সংগ্রাম। কে বিদ্রোহী ? বিদ্রোহী তুমি। তোমার অত্যাচারে সোনার ভারত আজ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। আমার লক্ষ লক্ষ গরীব ভাই-বোন আজ গোপনে ফেলছে চোখের জল। হুঁশিয়ার ইব্রাহিম লোদী ! ভারতবাসীর চোখের জল আর নীরব অভিশাপ, কখনও ব্যর্থ হবে না,—সাজা তোমাকে পেতেই হবে।

রেজা। তার আগে তুমি কবরে যাও' বেইমান !

[সংগ্রাম সিংহকে আক্রমণ করিল, উভয়ের যুদ্ধ]

সংগ্রাম। [যুদ্ধ করিতে করিতে] তুমি যাও কেরামৎ! বাইরে আমার ঘোড়া প্রস্তুত আছে।

কেরামৎ। মানুষ জেগেছে, ইব্রাহিম লোদী! মানুষ জেগেছে। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আমি মুক্তকণ্ঠে রাণা সংগ্রাম সিংহের জয়ধ্বনি দিয়ে যাচ্ছি—"জয় মহারাণা সংগ্রাম সিংহের জয়! জয় মহারাণা সংগ্রাম সিংহের জয়"।

[প্রস্থান।

[সংগ্রাম সিংহের সহিত যুদ্ধে রেজা খাঁর পরাজয় ও পলায়ন]

সংগ্রাম। আসি বন্ধু! আবার দেখা হবে মেবারের মুক্ত রণাঙ্গনে। জলন্ত গোলার সামনে মোকাবিলা হবে তোমায় আমায়; সেদিন দেখা যাবে সিংহ-শিয়ালের যুদ্ধে জয়ী হয় কে? তুমি না আমি।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে। [তোপধ্বনি ও জয়নাদ] জয় মহারাণা সংগ্রাম সিংহের জয়।

ইব্রাহিম। কোতল করবো। বান্দা বাঁদী বক্সী প্রহরী সবাইকে কোতল করবো। তারপর ওই কাফের সংগ্রাম সিংহের হিন্দু ফৌজদের নিশ্চিহ্ন করে মেবারকে দলে চষে একটা কংকালের স্তূপে পরিণত করবো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য ;

বাবরের প্রাসাদ।

বাবর।

বাবর। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এখনি সারা দুনিয়ার বুকে নেমে আসবে তামসী সন্ধ্যা। লাখো লাখো তারায় ভরে যাবে' আশমান। মরুময় আফগানীস্থানের বুকে ছড়িয়ে পড়বে চাঁদের আলো। রাত্রিও শেষ হবে। আবার আসবে দিন।.......আবার রাত্রি, আবার দিন। এমনি করে জীবনের মধ্যাহ্নও কেটে যাবে। হলো না—আমার আশা পূর্ণ হলো. না। জন্মভূমি সমরখন্দও উজবেকদের হাত থেকে উদ্ধার করা হলো না, ভারত-বিজয়ও অসমাপ্ত রয়ে গেল। হলো না খোদা! আমার আশা পূর্ণ হলো না।

গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ।

ফকির।—

গীত ;

ডাক এসেছে দূর হতে আজ কেন মিছে ম্রিয়মাণ।
সমরসাজে সাজ সাজ বীর, কর ওগো অভিযান॥

বাবর। ফকির সাহেব।

ফকির।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ;

মরুভূমি-বুকে রবিকর তুমি, ডাকিছে তোমার ভারতভূমি,
কাবুলের শের নীরব কেন বা, উড়াও বিজয় নিশান॥

বাবর। আমার সেলাম গ্রহণ করুন ফকির সাহেব! আপনি কোন্ দেশ থেকে আসছেন?

ফকির। ভারত থেকে।

বাবর। ভারতই কি আপনার জন্মভূমি?

ফকির। হ্যাঁ সম্রাট! ভারতই আমার জন্মভূমি, সোনার ভারত আজ পশুর অত্যাচারে জর্জরিত—তাই আমি এসেছি আফগানীস্থানের শেরকে আহ্বান করে নিয়ে যেতে।

বাবর। ফকির সাহেব!

ফকির। যে মোহে চেঙ্গিজ তৈমুর ভারতের মাটীতে রক্তের নদী বইয়ে ছিল, সে মোহ আজ আর সেখানে নেই। পথে পথে শুধু কংকালসার মানুষের ছবি, পত্র পুষ্প মুকুল হীন—সবুজ—বনানী,—জলহীন শুষ্ক নদীতট সাহারার মত খাঁ খাঁ করছে।

বাবর। কি বলছেন আপনি?

ফকির। ইব্রাহিমলোদীর অত্যাচারে ভারত আজ শ্রীহীন সম্রাট! সেই নব পিশাচকে হত্যা করে ফিরিয়ে নিয়ে এস তার লুপ্ত গৌরব।

বাবর। কিন্তু ফকির সাহেব! ভারতের কোন সামরিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সাহায্য না পেলে—

ফকির। তার জন্য চিন্তা নেই সম্রাট! তুমি সৈন্য সাজাও, পাঞ্জাব সুবেদার দৌলত খাঁ লোদী অচিরেই তোমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাবে।

[প্রস্থান।

বাবর। মেহেরবান খোদা! আমার অন্তরের ব্যথা তুমি জেনেছো। ভারত—ভারত! জহিরুদ্দীন মুহম্মদ—বাবর! এইবার সুরু হবে তোমার ভারত অভিযান।

হুমায়ুনের প্রবেশ।

হুমায়ুন। পিতা! আমার বাগিচার সব গোলাপ গাছগুলো মরে গেল পিতা!

বাবর। হুমায়ুন!

হুমায়ুন। পিতা! এবার তুমি পারস্য থেকে আমার জন্য বাজরাই গোলাপের চারা আনিয়ে দেবে। শুনেছি পারস্যের গোলাপই নাকি জগদ্বিখ্যাত।

বাবর। হুমায়ুন! দিনরাত শুধু বাঈজীর গান আর গোলাপের খোসবই এ মশগুল হয়ে থাকলে তোমার চলবে না পুত্র!

হুমায়ুন। কি করবো পিতা! না আছে যুদ্ধ, না আছে রাজকাজ। সময় কাটাবার জন্য যাহোক কিছু একটা চাই তো!

বাবর। মনে রেখো হুমায়ুন! তুমি বাবরের পুত্র। বাবর শব্দের অর্থ কি জান?

হুমায়ুন। জানি পিতা! বাঘ।

বাবর। বাঘের ছেলে হয়ে শৃগালের মত জীবন যাপন করা তো উচিত নয় পুত্র!

হুমায়ুন। না পিতা! আমি বাঘের মতই বাঁচতে চাই, আদেশ করুন, আমি সৈন্য সাজাই। কাল প্রভাতেই সমরখন্দ অভিমুখে যাত্রা করি।

বাবর। সৈন্য সাজাতে হবে পুত্র! তবে সমরখন্দের জন্য নয়—

হুমায়ুন। তবে?

বাবর। ভারত-বিজয়ের জন্য।

হুমায়ুন। পিতা!

বাবর। হ্যাঁ পুত্র! আমি ভারত-অভিযান করবো।

হুমায়ুন। কিন্তু, শুনেছি পিতা! ভারত-সম্রাট নাকি যথেষ্ট শক্তিমান।

বাবর। তোমার পিতাও দুর্বল নয় হুমায়ুন! তৈমুর চেঙ্গিজ খাঁনের রক্ত আমার দেহে আছে। আমার মন বলছে—এই, অভিযান ব্যর্থ হবে না।

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। জনাব! একজন বিদেশী দূত এই পত্র দিয়ে গেল।

[পত্রদান করিয়া প্রস্থান।

বাবর। বিদেশী দূত? পত্রপাঠকর! হুমায়ুন।

হুমায়ুন। [পত্রপাঠ] "'তামাম আফগানীস্থানকী মালিক—জহিরুদ্দীন মুহম্মদ—বাবর! বহুৎ বহুৎ—সেলাম পর আরজ এই যে,—আপনি যত শীঘ্র পারেন ভারত আক্রমণ করুন। আমরা আপনাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে রাজী আছি।—পাঞ্জাব সুবেদার দৌলতখান্।"

বাবর। ডাক এসেছে হুমায়ুন! ডাক এসেছে। ভারত আমায় ডাকছে, আমাকে যেতেই হবে। বাবর জীবনে কোন সুযোগেরই অপব্যবহার করেনি, আজও করবে না। হুমায়ুন! তৈরী হও—

হুমায়ুন। [আনন্দে] আবার যুদ্ধ—আবার তোপধ্বনি, আবার অস্ত্রের ঝনঝনায় কেঁপে উঠবে দিক্‌দিগন্ত। ওহো, কি আনন্দ! আমার পার্সী গোলাপের নেশা ছুটে গেছে পিতা! যুদ্ধের উন্মাদনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে আমার দেহ। হো-আফগানী ফৌজ! তৈয়ার হো যাও! ভারতথানে পড়েছে—

[প্রস্থান।

বাবর। এতদিন যে ভারত-বিজয়ের আমি স্বপ্ন দেখেছি, আজ তা সত্য হতে চলেছে। ভারত! সোনার ভারত! আমি হাজার হাজার খোরাসানী ফৌজ নিয়ে যাচ্ছি তোমার বুকে। অত্যাচারী পাঠান রাজত্বের অবসান করে, আমি মোগলসাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করবো। হে দীন দুনিয়ার মালিক! আমার এ অভিযান যেন ব্যর্থ না হয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাসংলগ্ন কক্ষ।

বিক্রমজিতের প্রবেশ।

বিক্রম। অপমান! অপমান! নিদারুণ অপমান! এখনও গাটা আমার ঘিনঘিন করছে। আমি একজন রাজা! আমায় কিনা ব্যাটা সজ গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে! এ অপমানের প্রতিশোধ যতদিন না নিতে পারছি, ততদিন আমার খেয়ে বসে শান্তি নেই।

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। সেলাম মহারাজ!

বিক্রম। আরে, বান্দা যে? তুমি এখানে?

বান্দা। সুলতান আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বিক্রম। কেন? কেন?

বান্দা। মহারাজের নাকি কয়েদখানায় বসে, বন্দীদের চীৎকার শুনে কানটা ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে, তাই আমাকে হুকুম দিলেন, বাঈজীকে নিয়ে আপনার একটু মনোরঞ্জন করতে।

বিক্রম। আহা! সুলতান আমাদের দয়ার অবতার। কারাধ্যক্ষ করে দিয়েছেন আমাকে, কিন্তু মহারাজের সম্মান ঠিকই রেখেছেন। আচ্ছা বান্দা! তুমি আমাকে ঠিক চিনতে পেরেছো?

বান্দা। কেন মশাই? আপনি তো গোয়ালিয়রের রাজা?

বিক্রম। নিশ্চয়।

বান্দা। গোখরো শাপের জাত; আজ বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হলেও আপনাকে চিনতে মোটেই কষ্ট হয় না।

বিক্রম। তা তো হবেই না।

বান্দা। আচ্ছা মহারাজ। আপনি গোয়ালিয়রের রাজা হয়ে আজ কিনা দিল্লীশ্বরের কারাধ্যক্ষের কাজ করছেন?

বিক্রম। আহা, তাতে ক্ষতিটা কি? দিল্লীশ্বর আমার বন্ধু, তাই তার উপকার করতে—

বান্দা। দিল্লীশ্বর আপনার বন্ধু, আর রাণা সংগ্রাম সিংহ বুঝি আপনার শত্রু?

বিক্রম। শত্রু মানে? মহাশত্রু। একবার পেলে হয়।

বান্দা। কি করবেন?

বিক্রম। মাথা নেবো, হাতে মাথা নেবো।

বান্দা। সেবার তো তাঁর প্রাসাদে গিয়েছিলেন, মাথাটা আনতে পারলেন না?

বিক্রম। নিশ্চয় পারতুম, নেহাৎ কাঁদতে লাগলো তাই।

বান্দা। রাণা সংগ্রাম সিংহ আপনার ভয়ে কেঁদেছিলেন?

বিক্রম। কান্না মানে! এমন ভেউ ভেউ করে কান্না আরম্ভ করলে, যা দেখে আমার মনটা গলে জল হয়ে গেল। তাইতো ক্ষমা করে চলে এলুম।

বান্দা। ইস্, তবে যে শুনলাম—

বিক্রম। কি শুনলে?

বান্দা। তিনিই নাকি আপনাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বিক্রম। বান্দা!

বান্দা। মেরেই ফেলতেন, শুধু আপনার কান্না দেখে মাথাটা নাকি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বিক্রম। কে—কে বললে এ কথা?

বান্দা। দিল্লীর লোকেরা তো সবাই বলছে।

বিক্রম। মিথ্যা কথা—নিছক মিথ্যা কথা।

বান্দা। আচ্ছা মহারাজ!

বিক্রম। বল।

বান্দা। আপনি তো শুনেছি বীর?

বিক্রম। বীর মানে? মহাবীরও বলতে পার।

বান্দা। সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধও তো একবার করেছিলেন?

বিক্রম। করেছিলাম।

বান্দা। তা দেশের স্বাধীনতাটা বজায় রাখতে পারলেন না?

বিক্রম। ইচ্ছা করলেই পারতাম। ভেবে দেখলাম স্থলতান আমার বন্ধু। তার সঙ্গে ঝগড়া করে কেন আর মনটা খারাপ করি।

বান্দা। আপনি দেখছি মহাপুরুষ।

বিক্রম। ঠিক ধরেছো। কিন্তু কি করে বুঝলে?

বান্দা। আপনার মহত্ব দেখে।

বিক্রম। কি রকম?

বান্দা। এই, আপনার স্বজাতি হলো শত্রু, আর বিদেশী বিজাতি পাঠান হলো আপনার বন্ধু, তাই—

বিক্রম। যাক, ওসব কথা যেতে দাও। তুমি বরং বাঈজীদের ডাক—

বাঈজীগণের প্রবেশ।

বান্দা। না ডাকতেই এই যে এসে গেছে। নিন্, খোস-মেজাজে নাচ গান শুনুন, আমি বাইরে অপেক্ষা করি।

[প্রস্থান।

বিক্রম। কি গো! সরাব টরাপ কিছু—?

১ম বাঈজী। এনেছি—। [সরাব দিল]

বিক্রম। বহুৎ আচ্ছা! নাও—আরম্ভ কর।

বাঈজীগণ।—

গীত।

বাতের অতিথি ওগো কয়োনা কথা।
নীরবে বাসর জাগি, জানাও ব্যথা।

তন্দ্রা আসে যদি অলস আঁখিতে,
ঘুমাও প্রিয় তুমি ফুল বিছানাতে,
মধুর অধরে চুম্বন পরশে ঢেলে দাও অমিয় যথা॥

[নৃত্যগীতের মধ্যে বিক্রমজিৎ মুহুর্মুহু সুরা পান করিতে লাগিলেন। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই নেশায় ডুবিয়া গেলেন।]

বাঈজীগণ। আদাব—আদাব—

[কুর্ণিশ করতঃ প্রস্থান।

বিক্রম। [নেশার ঘোরে] বাঈজীগণ! তোমরা আমার প্রাণ। তোমাদের ছেড়ে আমি স্বর্গেও যাবো না। গাও—গাও, আবার গাও—[ঘুমাইয়া পড়িল]

ছায়াবেগমের প্রবেশ।

ছায়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওই সেকেন্দারশাহ্ কবর থেকে আমাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে। আমি তার পেয়ারের বেগম। ইব্রাহিমের মায়ের চেয়ে সে আমাকেই বেশী ভালবাসতো; তাই আজ আমার স্থান হয়েছে অন্ধকার কারাগারে।

আলম খাঁর প্রবেশ।

আলম। ভাবি!

ছায়া। কে? কে ভাবি বলে ডাকলে?

আলম। আমি আলম—

ছায়া। ও—তা তুমি চাবুক আননি আলম খাঁ?

আলম। না ভাবি! আমি শয়তান ইব্রাহিম নই যে তোমাকে দিনরাত চাবুক মারবো।

ছায়া। তবে এখানে কি দরকার আলম খাঁ?

আলম। তুমি আমার সঙ্গে চলে এস ভাবি! আমি তোমাকে কারার বাইরে নিয়ে যাবো।

ছায়া। আলম!

আলম। রক্ষী প্রহরী সবাই নিদ্রিত। কারাধ্যক্ষ বিক্রমজিতকেও আমার নির্দেশে বান্দা বাঈজীদের দ্বারা সরাব পান করিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। এই চমৎকার সুযোগ! তুমি চলে এস ভাবি।

ছায়া। আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে আলম?

আলম। আপাততঃ আমি তোমাকে পাঞ্জাবেই নিয়ে যাবো। তারপর যুদ্ধ শেষ হ'লে আমি তোমাকে আগ্রায় পাঠিয়ে দেবো।

ছায়া। না না, ওরে আলম! এ কারাগার থেকে আমি কোথাও যাবো না।

আলম। ভাবি!

ছায়া। এখানে হাজার হাজার বন্দীরা আমায় মা বলে ডাকে। আমি যখন চাবুক খেয়ে হাসি, তারা তখন আমার জন্য কাঁদে। ওরে আলম! বাইরে যদি যেতেই হয়, আমার এই বন্দী পুত্রদের নিয়েই যাবো। একা নয়—

আলম। ভাবি! যাকে কখনও চোখে দেখিনি, পিতার স্নেহও কোনদিন পাইনি। শুধু তুমি—তুমিই মায়ের মত সস্নেহে মানুষ করেছিলে আমাকে। বাল্যের শত আবদার, সহস্র অনাচার সহ্য করেও বাঁচিয়েছিলে এই আলম খাঁকে। ভাবি! আমি জানি,...... তুমিই আমার মা।

ছায়া। আলম—

আলম। তাই যখনই দিল্লীতে এসে দেখলাম, ইব্রাহিম তোমাকে কৌশলে বন্দী করেছে, তখনই আমার দেহের রক্ত স্ফীত হয়ে

মাথায় জাগিয়ে তুলেছিল খুনের নেশা। ইচ্ছা হয়েছিল সেই মুহূর্তে ওই পশুটাকে মসনদ থেকে টেনে নামিয়ে এনে, ওর গর্বিত মাথাটা লুটিয়ে দিই তোমার পায়ের তলায়।

ছায়া। ওকথা বলিসনি আলম! ওরে দেওয়ালেরও কান আছে, ইব্রাহিম জানতে পারলে তোকেও হয়তো হত্যা করবে।

আলম। চোখের উপর তোমার এ নির্য্যাতন আমি সইতে পারছি না ভাবি। হয় তুমি আমার সঙ্গে এস, আর না হয় তুমিই আমাকে গলা টিপে হত্যা কর।

ছায়া। আমি হত্যা করবো তোকে? না রে আলম, না। তোরা সবাই আমার মত পাগল হোসনি, ইব্রাহিমের কি দোষ! আমি তাকে জানি।

আলম। দোষ কার ভাবি?

ছায়া। সব দোষ ওই বাঁদীর মেয়ে রিজিয়ার। ও যখন মায়ের হাত ধরে আমার প্রাসাদে এসেছিল,—তখন ওর মায়ের রূপ দেখে তোর দাদা তাকে সাদী করতে চায়। আমি জানতে পেরে সেই কসবীকে বেত্রাঘাত করে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিই; তারপর সে নাকি কোথায় পথে পড়ে মরেছিল, আর ওই মেয়েটাকে রেখে গিয়েছিল আমার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

আলম। ভাবি!

ছায়া। আজ—ও, ইব্রাহিমকে ভুলিয়ে তার বেগম হয়েছে। তাইতো, ওর মায়ের পিঠে চাবুক মারবার জন্য ওই-ই আমাকে কারাগারে পাঠিয়ে দিনরাত চাবুক খাওয়াচ্ছে।

আলম। তুমি আদেশ দাও ভাবি, ওই বাঁদীর মেয়েকে আমি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিই।

ছায়া। না আলম! আমি নিজে চাবুক খাবো, কিন্তু পরের পিঠে চাবুক মারতে দেব না। ওঃ, চাবুকে যে এত জ্বালা, একি আমি আগে জানতাম। তুই যা—কেউ দেখে ফেললে বিপদ হবে।

আলম। তোমাকে না নিয়ে আমি যাবো না ভাবি।

ছায়া। আলম!

আলম। কোন কথা আমি শুনবো না ভাবি; এস তুমি আমার সঙ্গে—

ছায়া। আমি যাবো কিন্তু আমার এই সব বন্দী পুত্ররা?

আলম। আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ভাবি, ওদের ও আমি কারামুক্ত করবো।

ছায়া। আমি চলে গেলে এই সব কারারক্ষীদের উপর ইব্রাহিম চরম নির্য্যাতন করবে।

আলম। ইব্রাহিম মেবার জয়ে এখন ব্যস্ত, তোমার কথা ভাববার তার অবকাশ নেই।

ছায়া। তবে চল আলম! ওঃ কতদিন পরে আবার আমি বাইরের আলো বাতাসে যাচ্ছি। ওরে! আমার চোখ থেকে দুনিয়ার সৌন্দর্য মুছে গেছে। বোধ হয় আমি অন্ধ হয়ে গেছি। চল চল, দেখি—সেকেন্দারশাহের দিল্লীর আজ কি রূপ?

আলম। খোদা! তুমি আমার সহায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিক্রম। [নিদ্রার ঘোরে] বাঈজী—তুমি—

[নেপথ্যে পাগলা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল]

একি! পাগলা ঘণ্টি বাজছে কেন, তবে কি বন্দী পালিয়েছে।

দ্রুত বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। পালিয়েছে—পালিয়েছে, বন্দী পালিয়েছে। একি! গোয়ালিয়র-রাজ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন! মহারাজ! ও মহারাজ! শুনছেন?

বিক্রম। [নিদ্রাভঙ্গে] কে? একি বান্দা! সে বাঈজীরা সব গেল কোথায়?

বান্দা। আরে রেখে দিন বাঈজী; এখন যে গর্দ্দান যায়।

বিক্রম। কেন হলো কি?

বান্দা। আব হলো কি? ছায়া বেগম ভাগোল্বা।

বিক্রম। সেকি! ছায়াবেগম পালিয়েছে?

বান্দা। জী হাঁ!

বিক্রম। তোরা কি সব নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলি?

বান্দা। আজ্ঞে, আমরা ঘুমুইনি, ঘুমোচ্ছিলেন আপনি।

বিক্রম। মুখ সামলে কথা বল্ বান্দা! আমি গোয়ালিয়ার-রাজ

বান্দা। চোখ রাঙাবেন না মশাই! আজ আপনিও যা—আমিও তাই।

বিক্রম। কি?

বান্দা। আপনি যখন সুলতানের চাকরী করছেন—

বিক্রম। চাকরী করছি?

বান্দা। চাকরী মানে পা-চাটা গোলামী। আমরা করছি পেটের জ্বালায়, আর আপনি করছেন প্রাণের দায়ে।

বিক্রম। বান্দা।

বান্দা। এর চেয়ে আপনার গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত মশাই। রাজা হয়ে আজ কিনা সুলতানের কারাগারে চৌকিদার সেজেছেন।

বিক্রম। আমি তোর গর্দান নেবো।

বান্দা। আপনার গর্দান কি করে বাঁচাবেন তাই ভাবুন মশাই। আপনাব মনিব তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে প্রথমে আপনাকেই কোতল করবে।

বিক্রম। বান্দা!

বান্দা। আপনাব মত লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে গাটা যেন কি রকম করে।

বিক্রম। তবে রে শয়তান [মারিতে উদ্যত]

বান্দা। বেশী রাগাবেন না মশাই! তাহ'লে হয়তো গায়ে বমি করে দেবো।

বিক্রম। হারামজাদা—

বান্দা। বন্দিনীকে খুঁজে দেখুন মশাই। নইলে প্রাণটাও যাবে আর এমন তেল মালিশ করা গোলামীটাও হারাতে হবে।

[প্রস্থান।

বিক্রম। দিল্লীর কুকুরগুলো পর্য্যন্ত আমাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে, ব্যাপার কি? কিন্তু বন্দিনী পালিয়ে গেলে যে আমাকেই গর্দান দিতে হবে। না, যেমন করে হোক আগে তাকে খুঁজে দেখি, তারপর এইসব নিমকহারামগুলোকে বিশ পয়জার মারবো। তবে আমার নাম বিক্রমজিৎ রায়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মেবার দুর্গ সম্মুখস্থ পথ।

জলন্ত মশাল হস্তে রেজাখাঁ ও তেজসিংহের প্রবেশ।

রেজা। গুপ্তপথ কোন দিকে ?

তেজ। পথের সন্ধান আমি দিচ্ছি। কিন্তু আমার সম্বন্ধে ?

রেজা। কোন চিন্তা নাই। সুলতানকে আমি জানিয়েছি, যুদ্ধে জয় হলে মেবারের সিংহাসন আপনিই পাবেন।

তেজ। উত্তম! আরও একটু এগিয়ে চলুন।

ছদ্মবেশে রহমৎ চুপিচুপি আসিয়া একপাশে লুকাইয়া সব শুনিতে লাগিল।

রেজা। রাণা দুর্গের মধ্যে আছেন ?

তেজ। আছেন। সৈন্যরাও নিদ্রিত। এই সুযোগে দুর্গ আক্রমণ করতে পারলে জয় আমাদের হবেই।

রেজা। তবে আর দেরী নয়। আমার ফৌজরা দুর্গের চারিদিকে ওৎ পেতে বসে আছে। সংকেত পেলেই তারা আমার সংগে মিলিত হবে।

তেজ। চলুন, ওই পাহাড়ের পিছন দিকে যে গুপ্ত পথটা আছে আপনাদের দেখিয়ে দিই।

রেজা। আসুন—

[উভয়ের প্রস্থান।

রহমৎ। সর্বনাশ! তেজ সিংহ সিংহাসনের লোভে সুলতানী ফৌজদের গুপ্ত পথের সন্ধান দিচ্ছে। মহারাণা বিশ্রাম করছেন। এই অতর্কিত আক্রমণে মেবার সৈন্য যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাইতো, এখন উপায় কি! যেমন করে হোক মহারাণাকে জাগিয়ে তুলতে হবে, সৈন্যদেরও সজাগ করে দিতে হবে।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে। জয়—দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীর জয়।

নেপথ্যে। জয়—মহারাণা সংগ্রাম সিংহের জয়।

উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় সংগ্রাম সিংহের প্রবেশ।

সংগ্রাম। বিশ্বাস ঘাতক। বিশ্বাস ঘাতক পাঠান সৈন্য রাত্রির অন্ধকারে দুর্গ আক্রমণ করেছে। রহমৎ, তেজসিংহ, প্রস্তুত হও। বেইমান ইব্রাহিম লোদীকে চরম শিক্ষা দিতে হবে।

সশস্ত্র ইব্রাহিম লোদীর প্রবেশ।

ইব্রাহিম। শিক্ষা তোমাকেই দিয়ে যাবো সংগ্রাম সিংহ। সেদিন চোরের মত আমার প্রাসাদে ঢুকে বন্দীকে ছিনিয়ে আনার জন্য আমি তোমাকে মেবারের মাটীতেই কবর দেবো।

সংগ্রাম। সাবধান লম্পট! সংগ্রাম সিংহ কাপুরুষ নয়। অতর্কিতে সে আক্রান্ত হলেও আত্মরক্ষা করার শক্তি তার যথেষ্টই আছে।

ইব্রাহিম। আমি তোমার গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে আমার পায়ের জুতি বানাবো রাজপুত।

সংগ্রাম। রাজপুতের চামড়ায় জুতি পরতে হলে তোমাকেও প্রাণের আশা ত্যাগ করতে হবে পাঠান।

ইব্রাহিম। আয় কাফের! দেখি তোর অস্ত্রে কত ধার!

সংগ্রাম। আয় শয়তান! দেখি তোর বাহুতে কত শক্তি!

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

বেগে রেজাখাঁর প্রবেশ।

রেজা। সৈন্যগণ, গুলি চালাও, তোপ দাগো। রাজপুতের রক্তে মেবারের মাটী সিক্ত করে দাও।

রহমতের প্রবেশ।

রহমৎ। বেইমান পাঠানের রক্তেই রাজস্থানের মাটী সিক্ত হবে দুষমন!

রেজা। তুই ইসলাম হয়ে হিন্দুর পক্ষে অস্ত্র ধরেছিস!

রহমৎ। ধরেছি। প্রয়োজন হলে তোর মত দু'দশটা ইসলামের মাথা আমার অস্ত্রেই মাটীতে গড়াগড়ি যাবে।

রেজা। আমাদের পক্ষে যোগদান কর্—দিল্লীর দরবারে চাকরী পাবি।

রহমৎ। বিদেশীর রাজভোগের চেয়ে আমার দেশের ভায়েদের দেওয়া শাক ভাত অনেক ভাল। কথা না বলে যুদ্ধ কর রেজাখাঁ।

রেজা। ভাল; তবে তোকেই আগে কবরে পাঠিয়ে দিই!

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

মেহের ও কর্ণদেবীর প্রবেশ।

মেহের। এই দিক দিয়ে পালিয়ে আসুন মা! এই পথেই চলুন আমরা পাহাড়ীয়া জংগলে আশ্রয় নিই।

কর্ণ। কিন্তু মহারাণা যে দুর্গের মধ্যে একাই যুদ্ধ করছেন; আমরা পালিয়ে যাবো, আর তিনি— ?

মেহের। তিনি বীর। অমিতবিক্রমে তিনি একাই শত্রু-সৈন্যদের ধ্বংস করছেন। তাঁর পিছনে তেজসিংহ আছে, রহমৎ আছে; তাঁর জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি আমার সঙ্গে চলে আসুন।

কর্ণ। মেবারের গৌরব-সূর্য পাঠানের পদতলে চির অস্তমিত হবে, আর মেবারের রাণী আমি—আমি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাবো ? না, না মেহের! যেমন করে হোক তুই একখানা অস্ত্র নিয়ে আয়, আমিও যুদ্ধ করবো।

মেহের। তা কেমন করে সম্ভব মা! দুর্গের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে,—সেখানে অস্ত্র আনতে গেলে নিজেদেরই জীবন বিপন্ন হবে।

কর্ণ। আমার উদয় ? উদয় কোথায় মেহের ?

মেহের। উদয়কে নিয়ে বাবা আগেই পালিয়েছে।

নেপথ্যে। জয় ইব্রাহিম লোদীর জয়।

মেহের। আর দেরী করবেন না, চারিদিকে পাঠান-সৈন্য ছড়িয়ে রয়েছে। পাঠানের হাত থেকে সম্মান রক্ষা করতে আপনি আমার সংগে পালিয়ে আসুন।

রেজা খাঁর প্রবেশ।

রেজা। পালাবার পথ বন্ধ।

মেহের। রেজা খাঁ!

রেজা। তুমিই বুঝি মেহের ? বাঃ, চমৎকার! খোদার দোয়ায়

যুদ্ধক্ষেত্রে এসে আমি আজ মাণিক কুড়িয়ে পেলাম! আর তার সংগে উপহার পেলাম দামী কোহিনুর।

মেহের। চুপ কর লম্পট। যা বলতে হয় আমাকে বল, কিন্তু মহারাণীর অসম্মান করলে—

রেজা। মহারাণী? ও, ইনিই বুঝি সংগ্রাম সিংহের পত্নী? ভালোই হয়েছে। এই হাবিলদার! আরবী ঘোড়া লে আও। মেবারের রাণীকে আমি দিল্লী নিয়ে যাবো।

কর্ণ। অস্ত্র আন মেহের, অস্ত্র আন। পাঠানের শ্লেষবাণী সহ্য করার আগে রাণী কর্ণদেবী আত্মহত্যা করবে।

রেজা। সে অবসর তোমাকে দেবো না রাণী! তোমাকে সুলতানের হারেমের বাঁদী করে দেবো, আর আমি সাদী করবো মেহেরকে।

মেহের। ওরে পাঠান-সেনানী! ভেবেছিস নারী বলে আমরা দুর্বলা? না না, আমরা ভারতের নারী। নিজেদের সম্মান রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে প্রাণ দিতেও জানি, আবার প্রাণ নিতেও জানি। সর, সর, পথ ছাড়—পারিস পুরুষের সঙ্গে লড়াই কর। নারীহত্যা করে বীরের অস্ত্র কলংকিত করিস না।

রেজা। না—না, হত্যা আমি তোমাদের করবো না, সুখ-স্বচ্ছন্দেই রাখবো।

কর্ণ। ঠাকুর! ঠাকুর! একটা বজ্রাঘাত—একটু বিষ—কি একখানা তলোয়ার দিয়ে তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারো দয়াময়।

রেজা। এখানে আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করলেও তোমার ডাকে কেউ আসবে না নারী।

সশস্ত্র আলম খাঁর প্রবেশ।

আলম। আসবে রেজা খাঁ! মায়ের সন্তান যে, মায়ের ডাকে সে নিশ্চয় ছুটে আসবে।

রেজা। আলম খাঁ! আমি তোমাকে হত্যা করবো।

আলম। পার, তাই কর। তবু আলম খাঁর দেহে প্রাণ থাকতে নারীনির্যাতন সে কোন দিনই সহ্য করবে না।

[উভয়ের যুদ্ধ; রেজা খাঁর পলায়ন।

কর্ণ। কে বাবা তুমি?

আলম। পরিচয় দেবার মত অবসর এখন নাই মা! শুধু জেনে রাখুন, আমি আপনার একজন মুসলমান সন্তান। পালিয়ে যান মা, পালিয়ে যান; এ রণক্ষেত্রে নারীর স্থান নেই।

কর্ণ। ঈশ্বর তোমার মংগল করুন বাবা! আয় মেহের—

[মেহের সহ প্রস্থান।

আলম। মেহের? এই মেহের? যার জন্য ইব্রাহিম লোদী উন্মাদ? না না, ওকথা চিন্তার এখন অবসর নাই। যুদ্ধ—যুদ্ধ চাই—

[প্রস্থান।

নেপথ্যে। জয় মহারাণা সংগ্রাম সিংহের জয়।

ইব্রাহিম লোদীর প্রবেশ।

ইব্রাহিম। ওঃ, পরাজয়! শোচনীয় পরাজয়! আমার আশী হাজার পাঠানসৈন্য যেবার উপত্যকায় ঘুমিয়ে পড়লো। রাজপুত-সৈন্যের হাতে আমার এই পরাজয়ের জন্য দায়ী কে?

রহমতের প্রবেশ।

রহমৎ। দায়ী আপনার নসীব।

ইব্রাহিম। কে তুই ?

রহমৎ। মহারাণার একজন মুসলমান সেনাপতি।

ইব্রাহিম। কি চাস এখানে ?

রহমৎ। আপনি আমার স্বজাতি, তাই আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। মহারাণা সিংহের মত এইদিকেই ছুটে আসছেন, আপনাকে সামনে পেলে নৃশংস ভাবে হত্যা করবেন। আমার অনুরোধ—আপনি পালান সুলতান।

ইব্রাহিম। পালিয়ে যাবো ? ভারত-সুলতান ইব্রাহিম লোদী একটা কাফেরের ভয়ে পালিয়ে যাবে ?

রহমৎ। আপনি একা কি করবেন ?

ইব্রাহিম। একাই আমি বিদ্রোহী সংগ্রাম সিংহকে কবর দেব।

রহমৎ। বুঝলাম, কবর আপনাকেই ডাকছে।

ইব্রাহিম। খবরদার বাঁদীর বাচ্ছা ! আমি তোকে হত্যা করবো।

রক্ষীবেশে সংগ্রাম সিংহের প্রবেশ।

সংগ্রাম। তলোয়ারখানা আমাকে দিন মেহেরবান ! এই ভেড়ীর বাচ্ছাকে আমিই জাহান্নমে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ইব্রাহিম। তুই ?

সংগ্রাম। মালিকের গোলাম।—নাম রমজান।

ইব্রাহিম। বহুৎ আচ্ছা ! এই নে তলোয়ার। এ সংগ্রাম সিংহের সেনাপতি, একে নির্মম ভাবে হত্যা কর।

সংগ্রাম। [তলোয়ার লইয়া] প্রস্তুত হন জনাব! আপনাকেই হত্যা করবো।

ইব্রাহিম। [সাশ্চর্য্যে] কে তুই?

সংগ্রাম। [বেশ উন্মোচন করিয়া] আমি রাণা সংগ্রাম সিংহ।

ইব্রাহিম। সংগ্রাম সিংহ?

সংগ্রাম। হা-হা-হা! শুধু অস্ত্রযুদ্ধেই নয়, বুদ্ধির যুদ্ধেও তোমার কাছে আমি জয়ী।

ইব্রাহিম। তুমি আমাকে হত্যা করবে?

সংগ্রাম। না, নিরস্ত্র বীরের গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে রাজপুত জানে না। যাও দিল্লীশ্বর! পরাজয়ের কালি মুখে মেখে রাজধানীতে ফিরে যাও। কিন্তু সাবধান! যেবার জয়ের আশা করলে এবার তোমাকে মরতেই হবে। এস রহমৎ।

[রহমৎ সহ প্রস্থান।

ইব্রাহিম। সংগ্রাম সিংহ! তোমার এ অপমান ইব্রাহিম লোদী কোনদিন ভুলবে না। আজ পরাজয় বরণ করে দিল্লী ফিরে গেলেও, আবার সে আসবে। সেদিন যেবার শুদ্ধ তোমাকে পুড়িয়ে একটা ভস্মস্তূপে পরিণত করে দেবে। নৃশংস মৃত্যুর বিভীষিকায় ভরিয়ে দেবে রাজস্থানের মাটী, আর্ত্তনাদ আর হাহাকারের নির্ম্মম কলরোলের মধ্যে চিরদিনের মত ঘুম পাড়িয়ে দেবে রাজপুত জাতির নাম!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

গীতকণ্ঠে উদয়সিংহের প্রবেশ।

উদয়।—

গীত।

সোনার বরণ রবির কিরণ ছড়ায় সে কোন দেশে?
জোছনা ধারায় সিনান করায় চাঁদ মামা যে হেসে।
ফাগুনেরই রঙীন নেশায়
মাতাল করে দখিন হাওয়ায়,
সবুজ বনের পাতায় পাতায় সুর আসে কার ভেসে?
বারো মাসে তের পার্বণ হেথায় লেগে আছে,
আমাদের এই সোনার ভারত কেন মলিন বেশে?

উদয়। সবাই মনে করে আমি শিকার করতে জানি না। আজ ইয়া বড় হরিণ মেরে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবো।

একবোঝা কাঠ মাথায় লইয়া কেরামতের প্রবেশ।

কেরামৎ। তা তো দেবো, দু আনার জায়গায় চার আনা পেলেই সব কাঠগুলো দিয়ে দেবো। কিন্তু পয়সাই বা দিচ্ছে কে, আর কাঠই বা নিচ্ছে কে? [উদয়কে দেখিয়া] আরে! উদয় যে! তুই এখানে?

উদয়। শিকার করতে এসেছি।

কেরামৎ। দেখ দেখি কাণ্ড! বাঘ ভাল্লুকে ভরা জংগলের পথে একা তোকে কে পাঠালে উদয়?

উদয়। কে আবার পাঠাবে? আমি নিজেই এসেছি।

কেরামৎ। না, আজ আর হাটে যাওয়া হলো না দেখছি। চল, বাড়ী ফিরে চল।

উদয়। উঁহু! শিকার না করে আমি বাড়ী ফিরবো না।

কেরামৎ। তুই একটুখানি ছেলে শিকার করবি কি রে। হালুম করে কোথা দিয়ে বাঘ বেরিয়ে মুখে করে নিয়ে যাবে।

উদয়। ইস্! নিলেই হলো আর কি! হাতে তীর ধনুক আছে কি করতে?

কেরামৎ। যাই মহারাণাকে কথাটা বলিগে, তারপর তিনি যা বোঝেন তাই করবেন। ঢেব ঢের ছেলে দেখেছি বাবা, কিন্তু এমন দুষ্টু ছেলে আর কোথাও দেখিনি।

উদয়। আচ্ছা কেরামৎ কাকা, তুমি তো আমাদের প্রাসাদেই থাকো, খাওয়া পরার কোন চিন্তাই তোমার নেই। তবে তুমি রোজ কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে বাজারে বেচতে যাও কেন বল তো?

কেরামৎ। দেখ উদয়! আমি চাষী মানুষ, চিরদিন খেটেই খেয়ে এসেছি—তাই আজ চুপ করে বসে থাকতে পারি না।

উদয়। সখ করে বুঝি কেউ খাটে?

কেরামৎ। খাটে, খাটা যাদের অভ্যাস আছে।

উদয়। কাকা!

কেরামৎ। পরের পেয়ে যারা বসে খায়, তারা মানুষ নয় উদয়!

উদয়। কি বলছো তুমি?

কেরামৎ। নিজের পরিশ্রমে নুন-ভাত খাওয়াও ভাল, তবু পরের দেওয়া রাজভোগের আশা করা উচিত নয়। যাক, তুই যখন একান্ত বাড়ী যাবি না, শোন, ওই পাহাড়ের উপর গিয়ে বসে থাক; আমি বাজার থেকে ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।

উদয়। বেশ, তাই হবে।

কেরামৎ। খবরদার! যেন নদীর ধারে যাসনি উদয়। দিনকাল ভাল নয়, চারদিকে পাঠানের চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি যাবো আর আসবো। [প্রস্থান।

উদয়। শিকার। হয় হরিণ নয় বাঘ। যা হয় একটা মারতেই হবে। আরে! ওই না মেহেরদি ঝরণা থেকে জল আনতে যাচ্ছে? দাঁড়াও, মজাটা দেখাচ্ছি—[তীর মারিল]

তীরবিদ্ধ কলসী লইয়া মেহেরের প্রবেশ।

মেহের। বেটা জংলীগুলো তীর চালাবার আর জায়গা পেলে না গা, দিলে আমার কলসীটা ফুটো করে। থামো, মহারাণাকে বলে—

উদয়। [হাসিয়া উঠিল]

মেহের। একি! উদয়! তুই এখানে?

উদয়। শিকার করতে এসেছি। ওকি মেহেরদি, তোমার কলসী দিয়ে যে সব জল পড়ে গেল?

মেহের। ফুটো কলসীতে জল থাকে নাকি? তীরটা কার বলতে পারিস উদয়? এরকম তীর তো জংলীদের হয় না।

উদয়। দেখি দেখি—[তীর লইয়া] একি! এযে মহারাণা সংগ্রাম সিংহের নাম লেখা।

মেহের। মহারাণার তীর ?

উদয়। তাইতো মনে হচ্ছে—

মেহের। তাঁর তীর এখানে এল কি করে ? আমি যে দেখে এলাম তিনি প্রাসাদে রয়েছেন।

উদয়। হয়তো কেউ চুরি করে এনেছে।

মেহের। কে সে ?

উদয়। যদি বলি আমি—

মেহের। ও—তুমিই তাহলে আমার কলসী ফুটো করে দিয়েছো ?

উদয়। লক্ষ্যটা পরখ করে দেখলাম।

তেজসিংহের প্রবেশ।

তেজ। এই যে মেহের—

মেহের। আজ্ঞে হ্যাঁ। কিছু বলতে চান ?

তেজ। বলার তো অনেক কিছুই আছে। কিন্তু—

মেহের। কিন্তু কি ?

তেজ। সুযোগ তো পাচ্ছি না।

মেহের। বলুন না ?

তেজ। বলছিলাম—মানে এত রূপ নিয়ে একা—এভাবে বাইরে আসা—

মেহের। ভয়ের কারণ আছে। এইতো ?

তেজ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি ? পাঠান-ফৌজরা যে রকম ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

মেহের। পাঠান-ফৌজের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার লোকের তো অভাব নেই সেনাপতি মশাই !

তেজ। তেমন লোক তোমাব কেউ হয়েছে নাকি?

মেহের। হয়েছে বৈকি—

তেজ। কে সে ভাগ্যবান?

মেহেব। আপনি।

তেজ। এ তুমি কি বলছো মেহের? তুমি কি আমার উপর অতখানি নির্ভর কর?

মেহের। কেন কববো না বলুন? আপনি বীর—

তেজ। তা তো নিশ্চয়—

মেহের। তবে?

তেজ। মেহের, সত্যই তোমাব রূপে আমি মুগ্ধ।

মেহেব। তাই নাকি?

তেজ। সত্য বলছি মেহের। যেদিন থেকে মেবারের প্রাসাদে তোমাকে দেখেছি—

মেহের। সেদিন থেকেই আপনি আমাকে—

তেজ। তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। তোমাকে আমি চাই মেহের।

মেহের। এ তো আমাব পরম সৌভাগ্য। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা ছিল।

তেজ। কিন্তু কি? বল—তোমার জন্য আমি—

মেহের। আমাকে সাদী করে ঘরের বউ করে নিতে পারবেন তো?

তেজ। তা কি করে সম্ভব? তুমি মুসলমান আর আমি হিন্দু। ঘরে না নিলেও তোমার জন্য আমি পৃথক প্রাসাদ তৈরী করে দেবো।

মেহের। থাক বীর! প্রাসাদে দরকার নাই, মেহের কুঁড়ে ঘরেই বাস করবে।

তেজ। তাহলে আমাকে—

মেহের। আপনাকে ভালবাসতে আমি পারি না রাজপুত।

তেজ। মেহের!

মেহের। বেল পাকলে কাকের কি তেজসিংহ!

তেজ। অর্থাৎ— ?

উদয়। অর্থাৎ—তুমি কাক আর মেহেরদি বেল; তাই না মেহেরদি ?

মেহের। ঠিক তাই। মেহেরের রূপ দেখেই যেতে হবে, তাকে পাওয়ার আশা বৃথা।

তেজ। কারণ ?

মেহের। কারণ, যাকে ঘরের বউ করে নিতে গেলে ধর্ম্মে বাধে, তার কাছে প্রেম নিবেদন করার আগে তোমার লজ্জা হওয়াই উচিত।

তেজ। আহা! তুমি বুঝতে পারছো না, আমি হিন্দু—

মেহের। আমিও মুসলমানী। আমাকে ঘরে নিতে তোমার যেমন ধর্ম্মে বাধে, তোমার ঘরে যেতে আমারও তেমনি ঘৃণা হয় রাজপুত।

তেজ। মেহের!

মেহের। ভুলে যেও না বীর! আমি রাণা সংগ্রাম সিংহের আশ্রিতা।

তেজ। আচ্ছা, দেখো যাবে এ দম্ভ তোমার কতদিন থাকে।

[প্রস্থান।

মেহের। চল দাদাভাই, যাই।

উদয়। কোথায়?

মেহের। বাড়ী।

পরিশ্রান্ত আলম খাঁর প্রবেশ।

আলম। নদীটা কোনদিকে বলতে পার?

মেহের। আপনি?

আলম। আমি পথের রাহী। বড় পিপাসিত—

মেহের। আপনি—

আলম। তুমি?

মেহের। আপনিই তো সেদিন পাঠান-সেনাপতির হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছিলেন?

আলম। তোমাকে দেখে যেন মনে হচ্ছে—কি নাম বল তো তোমার?

মেহের। আমার নাম মেহের।

আলম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মেহের। তা তুমি এখানে কেন?

মেহের। দেখছেন কাঁখে কলসী—

আলম। ও, আমার ভুল হয়ে গেছে। জল আনতে নদীতে যাচ্ছো বুঝি?

মেহের। না,—জল নিয়ে বাড়ীতে ফিরছি।

আলম। তবে তো তোমার কাছেই জল আছে, একটু জল দাও—বড় পিপাসা—

মেহের। জল নেই।

আলম। সেকি! জল নিয়ে ফিরছো, অথচ—

মেহের। কলসী ফুটো।

আলম। তার মানে?

মেহের। একজন তীর মেরে আমার কলসী ফুটো করে দিয়েছে।

আলম। কে সেই বেয়াদব! মেয়েছেলের সঙ্গে ঠাট্টা করতে তার সরম হলো না? তাকে তুমি চেন?

মেহের। চিনি।

আলম। তার নাম বল, আমি তাকে সাজা দেব।

উদয়। ইস্! তাই নাকি? তাকে সাজা দিতে গেলে নিজেকেই সাজা নিতে হবে।

আলম। তুমি?

উদয়। আমি—আমিই ওর কলসী ফুটো করে দিয়েছি।

আলম। তুমি কে?

উদয়। আমি মহারাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্র, নাম উদয়।

আলম। সাবাস্! সাবাস্ ভাই। সিংহের বাচ্ছা সত্যই তুমি সিংহ।

উদয়। তুমি কে?

আলম। আমি পাঠান।

উদয়। পালিয়ে চল দিদি, এ পাঠান—

আলম। ভয় নেই, আমি তোমার দিদিকে ধরে নিয়ে যাবো না।

মেহের। আয় উদয়, আমরা যাই— [আলম খাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল]

উদয়। কই, এস মেহেরদি—

মেহের। হ্যাঁ, যাই—[বার বার আলম খাঁর দিকে চাহিতে চাহিতে অনিচ্ছাসত্বে একটু অগ্রসর হইল]

আলম। [মেহেরকে দেখিয়া ভাবাবেশে] মেহের! তুমিই মেহের—? আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি—

তেজসিংহের প্রবেশ।

তেজ। মেবারে এসে ফিরে যাওয়া তোমার হবে না পাঠান। হয় প্রাণ দিতে হবে, নয় আজীবন বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

আলম। আমার অপরাধ?

তেজ। নারীহরণ।

মেহের। মিথ্যা দোষরোপ করছেন কেন সেনাপতি মশায়? উনি নির্দোষ।

তেজ। ও—পাঠানের মুখখানা বড় সুন্দর বুঝি? তাই একবার দেখে ভুলে গিয়েছ—না?

আলম। খবরদার যোয়ান! আমার সামনে এই নারীকে অপমান-সূচক কথা বললে আমি তোমার জিভটাই টেনে ছিঁড়ে ফেলবো।

তেজ। রাজস্থানের বুকে দাঁড়িয়ে হিন্দুবীরকে চোখরাঙাতে তোমার সাহস হয় পাঠান?

আলম। শুধু রাজস্থান কেন? দুনিয়ার যে-কোন স্থানে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস আমার আছে।

তেজ। উত্তম! আমি তোমাকে বন্দী করে আমাদের প্রাসাদে নিয়ে যেতে চাই।

মেহের। নিরপরাধকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া বীরের ধর্ম নয় সেনাপতি।

তেজ। সে বুঝবো আমি। বল পাঠান, স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার করবে, না বলপূর্বক—

আলম। বন্দী আমায় করতে ৲ পাণিপথ
তোমার সঙ্গে তোমাদের প্রাসাদে যেতে
মেহের। না না, তুমি সেখানে যেও
থেকে মহারাণা ক্ষিপ্ত, পাঠান বলে যদি তিনি
আলম। পাঠান বলে যদি তিনি আমাকে হ
বুঝবো—মহারাণা বীর নন—ভীরু, কাপুরুষ। তবে ৲
মেবারেশ্বর সংগ্রামসিংহ এত দুর্বলচিত্ত নন। চল বীর—
তেজ। এস যুবক! [আলম খাঁ সহ প্রস্থান।
মেহের। খোদা! এই আদর্শ মানুষটিকে তুমি রক্ষা কর
মেহেরবান! যেন পাঠানের কুকীর্তির জন্য ওকে জীবন দিতে না হয়।
উদয়। তুমি ভেবো না মেহেরদি! আমি ওকে বাঁচাবো।
মেহের। উদয়,-
উদয়। দেখে নিও মেহেরদি, বাবা যদি ওকে মুক্তি না দেয়,
আমি তাঁর পায়ে মাথা খুঁড়ে ওর মুক্তি আদায় করবো।
মেহের। যদি পারিস, আমি তোকে ভাল দেখে একখানা গান
শোনাবো।
উদয়। আগে শোনাও—

মেহের— গীত।

কে যেন আমারে ডাকে বারে বারে।
দুর আলেয়ায় চাঁদিনী আলোর খুঁজে মরি আমি তারে॥
যদিও নয়নে নাই, মনে যে সাড়াটি পাই,
আলেয়ার মত ফিরি পিছে পিছে গাহিয়া বীণার তারে॥

[উভয়ের প্রস্থান।

আলম। [৫~

মেহের—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দৌলত খাঁর প্রাসাদ।

খাতাপত্র বগলে লইয়া বিক্রমজিতের প্রবেশ।

বিক্রম। দুর্গা! দুর্গা! অনেক কষ্টে সুলতানের মনোরঞ্জন করে পাঞ্জাবের সুবেদারীটা আদায় করেছি। গোয়ালিয়র তো আছেই, তার উপর আবার পাঞ্জাব; একেই বলে কপাল।

গীতকণ্ঠে ফকিরের সাহেবের প্রবেশ

ফকির।— গীত।

এবার পাশা উল্টে যাবে ভাঙবে নদীর আল।
গজের কিস্তি মাৎ হবে ভাই ভরবে না কপাল॥

বিক্রম। এই যে ফকির সাহেব। আচ্ছা, কেন বল তো ঘেয়ো কুকুরের মত আমার পিছনে দিন রাত তুমি ঘেউ ঘেউ কর? যাও মসজিদে গিয়ে নমাজ পড়গে, পরকালের কাজ হবে।

ফকির।— পূর্ব্বগীতাংশ।

মসজিদে ভাই মন বসে না দেখে তোমার দশা,
হাতী নাকি গিলবে এবার তোমার মত মশা;
ব্যাঙ নাকি হায় স্বর্গপথে বাঁধবে কবে আল,
সমঝে চল, বলছি ভায়া, হয়ো না নাকাল॥

[প্রস্থান।

বিক্রম। বেটা ফকির তো নয়, যেন ধর্মের ষাঁড়।

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। এই যে মহারাজ! কখন তেল ফুরালো?

বিক্রম। কি বলছিস?

বান্দা। বলছি, আজ তিনবছর তো হরদমই তেল মালিশ করছেন, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

বিক্রম। তেল মালিশ করছি? কোথায়?

বান্দা। পায়ে গো, পায়ে।

বিক্রম। কেন হে? আমি কি বেতো রোগী নাকি, তাই দিন রাত তেল মালিশ করবো?

বান্দা। আহা, আপনার পায়ে নয়।

বিক্রম। তবে?

বান্দা। ওই যে দিল্লীতে যিনি বসে আছেন, সেই মহানুভব সুলতানের পায়ে।

বিক্রম। বান্দা!

বান্দা। এত তেল মালিশ করে শুধু পাঞ্জাবের সুবেদারীটা পেলেন?

বিক্রম। মুখ সামলে কথা বল্ বান্দা! একে আমি গোয়ালিয়রের রাজা, তায় পাঞ্জাব-সুবেদার হয়েছি। আমার অসম্মান করলে—

বান্দা। ঘরের বউ ঠিক আছে তো মহারাজ? না তিনিও বিকিয়ে গেছেন?

বিক্রম। বান্দা!

বান্দা। রাগবেন না। কাজ আদায় করতে হলে অনেক সময় ঘরের বৌঝিকেও মনিবের পায়ে বিকিয়ে দিতে হয়।

বিক্রম। আমার সঙ্গে তামাসা? বেটা মাম্‌দো ভূত! আজই তোকে—

বান্দা। থাক মহারাজ! ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ তো দেখেননি? এইবার দেখবেন। সে আসছে।

বিক্রম। কে?

বান্দা। তোমার যম।

[প্রস্থান।

বিক্রম। দুর্গা—দুর্গা! আমার এই কাঁচা বয়েস, এরই মধ্যে বলে কিনা যম আসছে। হারামজাদা অলুক্ষুণে বান্দাকে আমি একবার দেখে নেবো।

চৌকিদার বেশে ঈশানের প্রবেশ।

ঈশান। নমস্কার মহারাজ! পাঞ্জাবে আবার কি মনে করে?

বিক্রম। ঈশান! তুই এখানে কি করছিস?

ঈশান। আমি যে এখন চৌকিদার হয়েছি।

বিক্রম। বলিস কিরে ব্যাটা ছোটলোক? চাষবাস ছেড়ে শেষে কিনা চৌকিদারী করতে এসেছিস?

ঈশান। আপনি যদি রাজা হয়ে গোলামী করতে পারেন, তবে আমিই বা চৌকিদারী করবো না কেন?

বিক্রম। শিয়ালকুকুরগুলো বলে কি—এঁ্যা?

ঈশান। দেখুন মহারাজ! গাধার ডাক শুনলে শিয়ালকুকুরগুলো অমন পিছনে লেগেই থাকে।

বিক্রম। কে গাধা?

ঈশান। আপনি।

বিক্রম। চোপরাও বেকুব !

ঈশান। বেকুব আপনি। আপনার মুখ দেখলেও পাপ হয়। হিন্দু হয়ে হিন্দুবীর রাণা সংগ্রাম সিংহের পক্ষে যোগ না দিয়ে বিদেশী পাঠানের পা চাটতে আপনার লজ্জা করে না ?

বিক্রম। চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব।

ঈশান। ও গুমোর আজ আর সাজে না মহারাজ! যেদিন আপনি গোয়ালিয়রের স্বাধীন রাজা ছিলেন, সেদিন হয় তো আপনাকে দেখে দূরে দাঁড়িয়ে আমরা প্রণাম করতাম। কিন্তু আজ আপনাকে দেখলে আমাদের ঘৃণা হয়।

বিক্রম। ঈশান!

ঈশান। চোখ রাঙাবেন না। ঈশান আপনার চাকরও নয়, প্রজাও নয়। বেশী বাড়াবাড়ি করলে এই চৌকিদারের কাছেই অপমান হতে হবে। [প্রস্থান।

বিক্রম। হয়ে গেল! দৌলত খাঁর সুবেদারী হয়ে গেল। ফারমানটা দেখালেই খাঁ সাহেব সুড় সুড় করে কাগজ পত্র বুঝিয়ে দিয়ে সেলাম করে সরে দাঁড়াবে। একেই বলে নসীব।

নেপথ্যে। [তোপধ্বনি]

বিক্রম। ওকি! হঠাৎ তোপের শব্দ আসছে কোথা থেকে ?

নেপথ্যে। জয় জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবরের জয়।

বিক্রম। ও বাবা! বাবরের জয়ধ্বনি ? বাবর তো শুনেছি কাবুলের রাজা, এখানে তার জয়ধ্বনি আসবে কি করে ?

দৌলত খাঁর প্রবেশ।

দৌলত। [স্বগত] আমারই আমন্ত্রণ পেয়ে কাবুল-সম্রাট সগর্বে

ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেছে। মনে হয় বন্ধুর প্রতি শুভেচ্ছা জানাতে প্রথমেই তিনি পাঞ্জাবে এসেছেন। [প্রকাশ্যে] একি, রায় মশাই ! আপনি ?

বিক্রম। আর আমি ! হয়ে গেল।

দৌলত। কি হয়ে গেল ?

বিক্রম। এইটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। [ফারমান দিল]

দৌলত। [পাঠ করত] সুলতান আপনাকে পাঞ্জাব-সুবেদার করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু বড় অসময়ে এসে পড়েছেন দোস্ত ! পাঞ্জাব-সুবেদার দৌলত খান এখন আর দিল্লীশ্বরের তাঁবেদার নয়। সে স্বাধীন।

বিক্রম। আপনি সুলতানের হুকুম মানবেন না ?

দৌলত। আপনার সুলতানকে কবরে পাঠাবার জন্য আমি কাবুল-সম্রাটকে আহ্বান করে এসেছি।

নকীব। [নেপথ্যে] তামাম আফগানীস্থানকী মালিক জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবর হাজির হ্যায়।

বাবরের প্রবেশ।

বাবর। আপনিই পাঞ্জাব-সুবেদার দৌলত খান ?

দৌলত। হ্যাঁ দোস্ত ! আমি সাগ্রহে আপনারই আগমন প্রতীক্ষা করছি। চলুন, বিশ্রাম কক্ষে চলুন।

বাবর। বিশ্রামের অবকাশ নেই দোস্ত ! কোন কাজ অসম্পূর্ণ রেখে বাবর বিশ্রাম নিতে জানে না।

বিক্রম। [স্বগত] ইনিই বাবর ! ও বাবা ! একি মানুষ না দৈত্য ? হয়ে গেল, ইব্রাহিম লোদীর সুলতানীও হয়ে গেল, আর আমার সুবেদারীও শেষ হল। দুর্গা—দুর্গা— [প্রস্থানোদ্যত]

দৌলত। কোথায় চললেন রায় মশায়?

বিক্রম। দিল্লী।

দৌলত। এখন তো আপনাকে আমি দিল্লী যেতে দিতে পারি না।

বিক্রম। সে কি বন্ধু? [কাঁপিতে লাগিল]

দৌলত। দিল্লী অধিকার না করা পর্য্যন্ত আপনাকে এই পাঞ্জাবেই থাকতে হবে।

বিক্রম। দোহাই খাঁ সাহেব! নির্দয় হবেন না। পাঞ্জাবে থাকলে আমি দম আটকে মরে যাবো। আপনি তো জানেন—আমি ও সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। খামকা আমাকে—

বাবর। ও কে?

দৌলত। উনি হচ্ছেন গোয়ালিয়রের রাজা। সুলতানী ফৌজের হাতে পরাজিত হয়ে এখন সুলতানের গোলামী করছেন।

বাবর। তাহলে ওকে তো এখানে আটকে থাকতে হবে।

বিক্রম। হে বাবা বাবর সাহেব! কাটাকাটি মারামারি যা ইচ্ছা আপনার করুন, ওই বেটা ইব্রাহিম লোদীকে কেটে টুকরো টুকরো করুন, তাতে বরং আমার আনন্দই হবে। শুধু দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি মুখ বুজে গোয়ালিয়রে চলে যাবো—একটি কথাও বলবো না।

বাবর। বাবর মূর্খ নয় রাজা! এই, কে আছিস?

রক্ষীর প্রবেশ।

বাবর। যা—একে আমার ছাউনাতে নিয়ে যা। হাবিলদারকে বলবি—একে নজরবন্দী রাখতে।

বিক্রম। হয়ে গেল, গোয়ালিয়রের দফাও রফা হল, আর বিক্রম-জিতেরও গয়ায় যাবার ব্যবস্থা হল। হে মা দুর্গা! তোর এই অধম ছেলেটাকে দেখিস— [রক্ষী সহ প্রস্থান।

বাবর। আফগানীস্থানে বসে শুনেছিলাম, ভারতের পথে প্রান্তরে নাকি হীরা-জহরৎ ছড়ানো থাকে, গাছে গাছে নাকি সোনা ফলে, প্রাসাদে প্রাসাদে নাকি কোহিনুর ছড়াছড়ি যায়। কই? কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না?

দৌলত। এইতো সবে এলেন দোস্ত! কিছুদিন থাকলে দেখবেন, সত্যই ভারত সোনার দেশ।

বাবর। ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যসংখ্যা কত খাঁ সাহেব!

দৌলত। প্রচুর। আপনার সঙ্গে কত ফৌজ আছে?

বাবর। বারো হাজার আফগানী ফৌজ আছে।

দৌলত। মাত্র বারো হাজার?

বাবর। এই বারো হাজার ফৌজ নিয়েই আমি ভারত জয় করবো খাঁ সাহেব! যাক্, আমি আমার ছাউনীতে চললাম। তিন দিনের মধ্যেই আমি দিল্লী রওনা হব।

দৌলত। আমার ফৌজরা কি আপনার সঙ্গে যাবে?

বাবর। না, আপনার ফৌজদের আমি বিশ্বাস করি না। দিল্লী জয় না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার ফৌজরা থাকবে নিরস্ত্র—আমার নজরবন্দী।

দৌলত। কাবুল-সম্রাট!

বাবর। আপনাকেও নজরবন্দী থাকতে হবে আপনার প্রাসাদে।

দৌলত। কি বলছেন আপনি? আমি পাঞ্জাবের স্বাধীন সুবেদার—

বাবর। পাঞ্জাব এখন আমার অধিকারে। পিছনে শত্রু রেখে সামনে এগিয়ে যেতে আমি চাই না দোস্ত!

দৌলত। এই কি বন্ধুত্বের প্রতিদান?

বাবর। বাবর নিজের বাহুকেই বিশ্বাস করে না, আর তুমি তো ছার!

দৌলত। এ শঠতা দৌলত খানও নীরবে সহ্য করবে না। যাকে আমি আমন্ত্রণ করে এনেছি, সে যদি চায় আমার বুকে দাঁত বসিয়ে দিতে, তাহলে তাকে আমি এই সীমান্তেই কবর দেবো।

হুমায়ুনের প্রবেশ।

হুমায়ুন। তার আগে তোমাকেই কবরে যেতে হবে বেইমান।

দৌলত। বেইমান?

হুমায়ুন। বেইমান নও? নিজের দেশের ভাইকে শাসন করার জন্য যে বিদেশীকে ডেকে আনে, তার মত বেইমান দুনিয়ায় নেই।

দৌলত। আমি যদি পূর্বে জানতাম কাবুল-সম্রাট এমন বিশ্বাস-ঘাতক—

বাবর। বিশ্বাসঘাতক কাবুল-সম্রাট নয় দোস্ত! বিশ্বাসঘাতক তুমি নিজে। ইব্রাহিম লোদী অত্যাচারী হলেও সে তোমার স্বজাতি— পাঠান। তার ধ্বংসের জন্য তুমি যখন আমাকে আহ্বান করেছো, তখন প্রয়োজন হলে আমাকে একদিন কবরে পাঠানোর জন্যে আর একজনকেও ডেকে আনতে পারো।

দৌলত। মোগল-সম্রাট!

বাবর। ভয় নেই সুবেদার! মোগল-পাঠানের যুদ্ধশেষে আমি তোমাকে মুক্তি দেবো।

নেপথ্যে। [কামান গর্জ্জন] জয় মোগল-সম্রাট বাবরের জয়।

নেপথ্যে। হো স্থলতানী ফৌজ, সজাগ হো যাও।

বাবর। ব্যাপার কি পুত্র?

হুমায়ুন। মনে হয় স্থলতানী ফৌজ আমাদের আক্রমণ করেছে।

বাবর। যাও পুত্র! কামান দেগে উড়িয়ে দাও পাঠানসৈন্য।

হুমায়ুন। যথাদেশ পিতা!

[প্রস্থান।

বাবর। তুমি কি করবে খাঁ সাহেব?

দৌলত। আমি যুদ্ধ করেই মৃত্যুকে বরণ করতে চাই সম্রাট!

বাবর। বাবর আফগানীস্থানের শের দৌলত খান! মূষিক শিকার সে করে না। ধর অস্ত্র, যুদ্ধ করেই বেইমানীর ইনাম নাও।

[উভয়ের যুদ্ধ ও দৌলত খানের প্রস্থান।

বাবর। হা-হা-হা! আমি মোগল—স্থদূর আফগান থেকে যখন ভারতের বুকে এসেছি, তখন সহজে ফিরবো না। তৈমুর, চেঙ্গিজ খান এসেছিলেন এদেশ লুঠ করতে, আর আমি এসেছি মোগল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। তাই আমার প্রয়োজনে এইসব পাঠান-শক্তির আমি মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলবো, যাতে তারা কোন দিন আমার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মেবার-প্রাসাদ।

গীতকণ্ঠে উদয়ের প্রবেশ।

উদয়।—

গীত।

দেশের তরে যায় যদি প্রাণ দুঃখ কিছুই নাই।
আমার স্মৃতি থাকবে ধরায় সেই তো আমি চাই।
স্বদেশ আমার সোনার ভারত আমার জনমভূমি,
বরাভয় করে দানিও অভয়—কারও আশীষ তুমি;
কোটি মানুষের মাঝারে যেন তোমারে খুঁজিয়া পাই।

সংগ্রাম সিংহের প্রবেশ।

সংগ্রাম। এ দেশের গান তুমি কার কাছে শিখেছো উদয়?

উদয়। ফকির সাহেবের কাছে। কেমন গান বাবা?

সংগ্রাম। খুব ভাল। এমনি গানেরই তো আজ প্রয়োজন উদয়।

কর্ণদেবীর প্রবেশ।

কর্ণ। শুনছো মহারাণা! কাবুল-সম্রাট বাবর ভারত আক্রমণ করেছে।

সংগ্রাম। শুধু আক্রমণ নয় রাণি। পাঞ্জাবের সুবেদার দৌলত খানকে পরাজিত করে পাঞ্জাব অধিকারও করেছে।

কর্ণ। অথচ ওই দৌলত খান আর তুমিই তাকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছো।

সংগ্রাম। জানিয়েছি।

কর্ণ। তাই ভয় হয়, দৌলত খানের মত যদি সে তোমাকেও আক্রমণ করে ?

সংগ্রাম। বাবর মূর্খ নয় রাণি! সে জানে আমি হিন্দু এবং ভারতবাসী। তাই এত সহজে সে আমার সঙ্গে শক্রতা করবে না।

কর্ণ। তবে দৌলত খাঁকে—

সংগ্রাম। দৌলত পাঠান। তাই তার উপর মোগলের জাত-ক্রোধটা বেশী থাকা স্বাভাবিক। তা ছাড়া মোগল-সম্রাট এদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে আসেনি রাণি!

কর্ণ। মহারাণা!

সংগ্রাম। ওরা লুণ্ঠনকারী। হীরা জহরতের আশায় ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করে, ইব্রাহিমকে গদীচ্যুত করে আবার স্বদেশে ফিরে যাবে।

কর্ণ। তাতে তোমার কি লাভ?

সংগ্রাম। অদূর ভবিষ্যতে সারা হিন্দুস্থানের বুকে আমি আবার হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের সুযোগ পাব।

কর্ণ। ছিল পাঠান, এল মোগল। আমার কিন্তু ভাল বলে মনে হচ্ছে না মহারাণা।

সংগ্রাম। এ জটীল রাজনীতি তুমি বুঝবে না কর্ণদেবি, তুমি উদয়কে নিয়ে অন্তঃপুরে যাও।

কর্ণ। তোমার কাজের সমালোচনা করার মত সাহস আমার নাই। তবে যা করবে নিজের ভাল মন্দ বুঝেই কর। আয় উদয়—

[উদয়সহ প্রস্থান।

সংগ্রাম। কণ্টকে নৈব কণ্টকম্। মোগলসম্রাট বাবর ইব্রাহিমকে পরাজিত—নিহত করতে পারলেই দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে বসবে, কিন্তু, বাবর যদি দেশে ফিরে না যায়? তার জন্য চিন্তা কি? যে অস্ত্রে আমি আশী হাজার পাঠানসৈন্যকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি, সেই অস্ত্রেই বিধ্বস্ত করবো ওই পরগাছা মোগলফৌজদের।

আলম খাঁ সহ তেজসিংহের প্রবেশ।

তেজ। মহারাণার জয় হোক!

সংগ্রাম। কি সংবাদ তেজসিংহ?

তেজ। মহারাণা! এই পাঠান-গুপ্তচরকে আমি বন্দী করে এনেছি।

সংগ্রাম। পাঠান-গুপ্তচর?

আলম। গুপ্তচর আমি নই মহারাণা! আর গুপ্তচরবৃত্তিও আমার পেশা নয়।

সংগ্রাম। তুমি কে যুবক? কি তোমার পরিচয়?

আলম। আমি পাঠান-সেনানী।

সংগ্রাম। মেবারে কি উদ্দেশ্যে এসেছো?

তেজ। নারীহরণ করতে মহারাণা! আপনারই আশ্রিতা মেহেরকেও বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল।

সংগ্রাম। পাঠান-সেনানি!

আলম। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা মহারাণা!

সংগ্রাম। মিথ্যা?

মেহেরের প্রবেশ।

মেহের। হ্যাঁ পিতা! মিথ্যা।

সংগ্রাম। মেহের! কি বলছিস মা! তেজসিংহের মুখে যে শুনলাম—

মেহের। যা শুনেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই পাঠানযুবকই গত যুদ্ধের সময় আমাকে আর মা মহারাণীকে শত্রুর হাত হতে রক্ষা করেছিলেন।

সংগ্রাম। এও কি সত্য?

কর্ণদেবীর প্রবেশ।

কর্ণ। এক বর্ণ মিথ্যা নয়। এই পাঠানযুবকই পাঠানের হাত থেকে আমাদের প্রাণ, মান রক্ষা করেছে।

সংগ্রাম। পাঠানের মধ্যে এমন মানুষ আছে?

আলম। আছে মহারাণা! পাঠানের মধ্যে এমন অনেক আছে, যারা প্রাণ দিয়েও নারীর মান রক্ষা করতে জানে।

সংগ্রাম। কিন্তু তেজসিংহ যে বল্লে—

মেহের। তেজসিংহের কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না, আর তেজসিংহকেও আপনি বেশী বিশ্বাস করবেন না মহারাণা!

তেজ। মেহের!

মেহের। চোখরাঙালে কি হবে সেনাপতি মশাই! জানেন তো মেয়েছেলের পেটে কথা হজম হয় না। [সংগ্রাম সিংহের প্রতি] মহারাণা! আপনার এই সেনাপতি আমার কাছে প্রেম নিবেদন করতে চেয়েছিল, আমি রাজী না হওয়ায়—

সংগ্রাম। তেজসিংহ! আমার মনে হচ্ছে, তোমার মত নারকীর ওই কলংকিত মুখখানা পদাঘাতে চূর্ণ করে দিই।

তেজ। এ মিথ্যা। আমার বিরুদ্ধে এ একটা ষড়যন্ত্র মাত্র।

রহমতের প্রবেশ।

রহমৎ। এ কথা যে সত্য নয়—তাই বা কেমন করে প্রমাণ করবেন সেনাপতি মশায়?

তেজ। রহমৎ!

রহমৎ। স্বার্থের লালসায় শত্রুর হাতে হাত মিলিয়ে যে নিজের দেশের সর্বনাশ করতে পারে, তার দ্বারা সব কিছুই সম্ভব।

সংগ্রাম। এ তুমি কি বলছো রহমৎ?

রহমৎ। এতদিন আপনাকে বলিনি মহারাণা! কিন্তু আজ দেখছি তেজসিংহের কুকীর্ত্তির কথা প্রকাশ না করলে মেবারের সর্বনাশ হতে পারে, তাই বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে।

সংগ্রাম। বল রহমৎ! তেজসিংহের বিরুদ্ধে তোমার আরও কি অভিযোগ আছে?

রহমৎ। মহারাণা! গত সুলতানী ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধে আপনার এই সেনাপতিই শত্রুসৈন্যদের দুর্গ প্রবেশের গুপ্তদ্বার দেখিয়ে অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ করে দিয়েছিল।

সংগ্রাম। তেজসিংহ!

কর্ণ। শাস্তি দাও মহারাণা! এই দেশদ্রোহী শয়তানকে শাস্তি দাও। যে বিশ্বাসঘাতকতা করে দেশের বুকে আঘাত হানতে পারে, সে প্রয়োজন হলে তোমার বুকেও ছুরি বসিয়ে দিতে পারে।

[প্রস্থান।

মেহের। আজ যে পরিচয় তেজসিংহের পাওয়া গেল, তাতে তাকে ক্ষমা করলে মহারাণার নিজেরই ক্ষতি হবে। ভেবে দেখুন পিতা! দেশের শত্রু যে, সে আপনারও শত্রু।

সংগ্রাম। ঠিক বলছিস মা! দেশের শত্রু যে, সে আমারও শত্রু। রহমৎ! তেজসিংহ যে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিল, তার প্রমাণ আছে?

রহমৎ। প্রমাণ আমি নিজেই মালিক! আমিই ছদ্মবেশে ওদের দুরভিসন্ধি জানতে পেরে সেনাপতি কুমারসিংহকে সংবাদ দিয়েছিলাম।

সংগ্রাম। তাই কুমারসিংহের সংকেত পেয়েই আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম। নইলে সেই গভীর রাত্রে পাঠানসৈন্যের হাতে হাজার হাজার রাজপুতের রক্তে লালে লাল হয়ে যেতো মেবারের মাটী। তেজসিংহ! আমি ভেবে পাচ্ছি না, তোমার মত পিশাচের কি শাস্তি হওয়া উচিত।

তেজ। মহারাণা,—

মেহের। শাস্তি দিন পিতা।

আলম। এবারের মত এ যুবককে আপনি ক্ষমা করুন মহারাণা।

রহমৎ। আমারও অনুরোধ মালিক। এবারের মত তেজসিংহকে আপনি ক্ষমা করুন।

সংগ্রাম। ক্ষমা? হ্যাঁ—হ্যাঁ, ওকে আমি ক্ষমাই করবো। এই, কে আছিস?

রক্ষীর প্রবেশ।

সংগ্রাম। যা, একে নিয়ে যা—

তেজ। মহারাণা!

সংগ্রাম। পুরস্কার বন্ধু! তুমি আমার যে উপকার করেছ, তার জন্য আমি তোমায় পুরস্কার দিচ্ছি—প্রাণদণ্ড।

রহমৎ। তেজসিংহ! মহারাণার কাছে তুমি ক্ষমা চাও—

তেজ। তেজসিংহ অপরাধী হলেও সে রাজপুত। প্রাণের ভয়ে নতি স্বীকার করতে সে জানে না। মহারাণা সংগ্রাম সিংহ! সত্যই আমি চেয়েছিলাম গোপনে তোমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে তোমার হাত থেকে মেবারের সিংহাসন ছিনিয়ে নিতে, কিন্তু তা হল না। ঈশ্বর তোমার সহায়, তাই অকালে আমার জীবন-রবি চির অস্তমিত হল।

সংগ্রাম। তেজসিংহ!

তেজ। যাবার সময় আমিও তোমাকে বলে যাচ্ছি মেবারেশ্বর! তোমার মৃত্যুরও বেশী দেরী নেই। বাবর এসেছে, তারই তোপের মুখে উড়ে যাবে তুমি আর তোমার সাধের মেবার—

[রক্ষীসহ প্রস্থান।

আলম। মহারাণা কি আমাকে বন্দী করে রাখতে চান?

সংগ্রাম। না যুবক! পাঠান হলেও তুমি আমার অতিথি। যথাযোগ্য বিশ্রামের পর আমি তোমাকে সসম্মানে দিল্লী পাঠিয়ে দেবো।

রহমৎ। মহারাণা! আরও একটা দুঃসংবাদ আছে—

সংগ্রাম। বল?

রহমৎ। মেহেরের পিতা কেরামতকে—

মেহের। বল—বল রহমৎ, আমার পিতার কি হয়েছে?

রহমৎ। তোমার পিতাকে পাঠান-গুপ্তচরেরা বন্দী করে নিয়ে গেছে।

মেহের। ওঃ—খোদা!

সংগ্রাম। পাঠান-গুপ্তচরের হাতে কেরামৎ কেমন করে বন্দী হল রহমৎ?

রহমৎ। পাঠান-গুপ্তচরেরা সওদাগর বেশে পাহাড়িয়া বাজারে

এসেছিল, কেরামৎ কাঠ বিক্রী করতে সেখানে গেলে, তারা কৌশলে তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিল্লীর পথে রওনা হয়।

সংগ্রাম। আমার নগররক্ষীরা কোথায় ছিল ?

রহমৎ। সংবাদ পাওয়া মাত্র তারা ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু দ্রুত-গামী অশ্বে চোখের পলকে পাঠানরা মেবার-সীমা পার হয়ে যায়।

মেহের। আমার বৃদ্ধ পিতাকে হারিয়ে আমি বাঁচতে চাই না মহারাণা !

রহমৎ। পাঠান-সৈন্যের যাওয়ার পথ থেকে এই স্বর্ণ-রঞ্জিত পত্রখানা পাওয়া গেছে মালিক !

সংগ্রাম। কার পত্র ? কি লেখা আছে ও পত্রে ?

রহমৎ। সুলতানের নামাঙ্কিত পত্র মেহেরবান ! তিনি জানিয়ে-ছেন, মেহেরকে দিল্লীর প্রাসাদে পাওয়া গেলে বৃদ্ধ কেরামতকে তিনি মুক্তি দেবেন।

মেহের। আমি যাবো—আমি যাবো। আমার পিতার মুক্তির জন্য দিল্লীর প্রাসাদে আমাকে যেতেই হবে। শয়তান ইব্রাহিম লোদীর কামনার আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েও আমি চাই আমার পিতার জীবনরক্ষা করতে।

সংগ্রাম। তা হয় না মা ! সেই নরপিশাচ ইব্রাহিমের কাছে আমি তোকে যেতে দিতে পারি না।

আলম। মহারাণার অনুমতি পেলে, মেহেরের প্রাণ মান রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে আমি ওকে দিল্লী নিয়ে যেতে পারি।

সংগ্রাম। সে অসম্ভব যুবক ! তুমি বরং পার তো মেহেরের পিতাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করগে।

আলম। আপনি ইব্রাহিম লোদীকে চেনেন না মহারাণা।

মেহেরকে না পেলে, সে ক্ষিপ্ত হয়ে বৃদ্ধকে হত্যাই করবে। তাই মেহেরকে তার সামনে হাজির করে কৌশলে ওর পিতাকে মুক্ত করতে হবে।

সংগ্রাম। কিন্তু মেহেরকে তার সামনে দিয়ে আবার কেমন করে ফিরিয়ে আনবে যুবক? সে যদি মেহেরের নারীত্বে কলংকের কালিমা মাখিয়ে দেয়?

আলম। আলম খাঁ জীবিত থাকতে মেহেরের নারীত্বকে অপমান করার শক্তি ইব্রাহিম লোদীর হবে না। যে কৌশলে মেহেরের পিতাকে উদ্ধার করবো, সেই কৌশলেই মেহেরকে আমি রক্ষা করবো মহারাণা।

মেহের। অনুমতি দিন মহারাণা! আমি এর সঙ্গে দিল্লী যাই। আমার জন্য চিন্তা করবেন না। মেহের মরবে, তবু ইব্রাহিমের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেবে না।

সংগ্রাম। আমি তোকে ধরে রাখতে চাই না মা! হ্যাঁ, শোন যুবক! আমি তোমাকে বিশ্বাস করে তোমার সঙ্গে মেহেরকে আগুনে ঝাঁপ দিতে পাঠাচ্ছি। মনে রেখো, এ নারী সংগ্রাম সিংহের আশ্রিতা।

আলম। আপনিও মনে রাখবেন মহারাণা! আলম খাঁর দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে সুলতানী রক্ত। ইব্রাহিম লোদী বয়সে আমার চেয়ে বড় হলেও, আমি সেকেন্দার শাহের ভাই—তার পিতৃব্য। সুলতানী তক্তের কলংক মুছে দিতে যদি প্রয়োজন হয়, আমি তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব, তবু মেহেরের গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগতে দেবো না।

সংগ্রাম। যুবক!

আলম। মেহেরের মত লক্ষ মেয়ের নয়নাশ্রু মুছিয়ে দিতে

আমি আজ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ছুটে যাবো দিল্লীর প্রাসাদে। এবার ইব্রাহিম লোদী মরবে, তার শয়তানী রক্তে স্নাত হয়ে এই আলম খাঁই বসবে দিল্লীর মসনদে। এসো মেহের—

[মেহের সহ প্রস্থান।

সংগ্রাম। রহমৎ!

রহমৎ। কি হুকুম মালিক?

সংগ্রাম। ঘোড়া প্রস্তুত কর।

রহমৎ। কেন মেহেরবান?

সংগ্রাম। আমি দিল্লী যাবো।

রহমৎ। সেকি?

সংগ্রাম। আশ্রিতরক্ষা করা রাজপুতের ধর্ম্ম রহমৎ! পাঠানকে আমি বিশ্বাস করি না। তাই আলম খাঁর পিছনে ছদ্মবেশে আমি যাবো।

রহমৎ। রহমৎ বেঁচে থাকতে আপনাকে দিল্লী যেতে হবে কেন মালিক? আমিই এখনি ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের পিছনে রওনা হচ্ছি।

সংগ্রাম। রহমৎ!

রহমৎ। রাজপুত-কুলগৌরব রাণা সংগ্রামসিংহ আপনি; আমার চেয়ে আপনার জীবনের দাম অনেক বেশী। তাই মৃত্যুর গহ্বরে আগে রহমৎই গলা বাড়িয়ে দেবে। [প্রস্থানোদ্যত]

সংগ্রাম। রহমৎ! ভাই!—

রহমৎ। [ফিরিয়া] মালিক! রহমতের মত সামান্য একজন সৈনিক গেলে দেশের এমন কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু আপনার মত রাজা গেলে দেশের যে ক্ষতি হবে, শত রহমতেও তা পূরণ করতে পারবে না। [প্রস্থান।

সংগ্রাম। তবে যাও বন্ধু! মরার আগে মেবারের বুকে আমি আমার মত লক্ষ লক্ষ সংগ্রাম সিংহ তৈরী করে রেখে যেতে চাই— যারা ইতিহাসের বুকে বুকের রক্ত দিয়েও লিখে যাবে স্বাধীনতা-যুদ্ধের জীবন্ত কাহিনী।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ইব্রাহিমের প্রাসাদ।

ছায়াবেগমের প্রবেশ।

ছায়া। এত অত্যাচারেও তবু ভুলতে পারি না দিল্লীর হারেমের কথা। যেখানেই থাকি, তবু মনটা পড়ে থাকে এখানে। সবই আছে অথচ কিছুই নাই। এখনও রংমহল ভরে যায় বাঈজীদের গানে, উজীর আমীরদের তোষামোদে গরম হয়ে ওঠে দিল্লীর দরবার। হাজার হাজার রক্ষী প্রহরী নফর ফেরে অলিতে গলিতে। তবু কেন কাঁদে মন? কেন? কেন? বল সেকেন্দার শাহ্! তুমি কবরে গেলেও তোমার লক্ষ লক্ষ স্মৃতিগুলো কেন ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে?

রিজিয়ার প্রবেশ।

রিজিয়া। এই, কে তুই?

ছায়া। আমি বেগম সাহেবা।

রিজিয়া। বেগম সাহেবা? ও, তোমাকে চিনেছি, তুমি সেই শয়তানী।

ছায়া। [সক্রোধে] চুপ! চুপ কর! নইলে আমি তোর জিভটাই ছিঁড়ে ফেলবো।

রিজিয়া। কি? দিল্লীর বউ-বেগমকে অপমান! এই, কে আছিস? আমার চাবুক দিয়ে যা—

চাবুকহস্তে জনৈক রক্ষীর প্রবেশ ও চাবুক দিয়া প্রস্থান।

ছায়া। দিল্লীর বউ-বেগম!— কথাটা শুনলে হাসি পায়। যার মা ছিল একদিন আমার হারেমের বাঁদী, সে হয়েছে আজ বউ-বেগম।

রিজিয়া। খবরদার পাগলি! চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব। [চাবুক আস্ফালন]

ছায়া। ওই চাবুকখানা তোর মায়ের মত তোরও পিঠে পড়তে পারে বাঁদীর মেয়ে।

রিজিয়া। এত স্পর্ধা! মর তবে হারামজাদী! [চাবুক প্রহার]

ছায়া। শুধু চাবুক কেন? পার তো প্রাণদণ্ড দাও। আজ চাকা ঘুরে গেছে। একদিন তোর মাকে আমি চাবুক মেরে হারেম থেকে দূর করে দিয়েছিলাম, আর আজ—

রিজিয়া। যা, দূর হ এখান থেকে—

ছায়া। কেন যাবো? কার হুকুমে যাবো? একটা বাঁদীর মেয়ের ভয়ে আমার স্বামীর প্রাসাদ ছেড়ে আমি পালিয়ে যাবো? মার, মার, চাবুক মার! প্রাণদণ্ড দে—দেখি আমার অন্তর্নিহিত বেদনার লেলিহান অগ্নিশিখায় তোকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারি কি না।

ইব্রাহিমের প্রবেশ।

ইব্রাহিম। কে কথা বলছে? কার কণ্ঠস্বর? একি! তুই আবার এখানে কেন এসেছিস রাক্ষসি?

ছায়া। তোর বউ-বেগমের মাথাটা চিবিয়ে খাবার জন্য।

রিজিয়া। সাবধান বাঁদি! [চাবুক মারিতে উদ্যত]

ইব্রাহিম। না না, তুমি চাবুক মেরো না! রিজিয়া! তোমার কোমল হাতে লাগবে। তার চেয়ে বাঁদীকে ডাক, সে ওকে চাবুক মেরে ঘাড় ধরে কারাগারে রেখে আসুক।

ছায়া। বাঃ! চমৎকার! ওরে ইব্রাহিম! ওরে স্ত্রীর আজ্ঞাবাহী ভৃত্য! তোর মা যেদিন কবরে গেল, সেদিন আমিই যে সন্তান-স্নেহে তোকে মানুষ করেছিলাম,—তার কি এই প্রতিদান?

ইব্রাহিম। প্রতিদান? হাঃ-হাঃ-হাঃ! তোর সেই উপকারের বিনিময়ে আমি তোকে জীবন্ত কবর দেবো নারি।

ছায়া। ইব্রাহিম!

রিজিয়া। চুপ! আমার স্বামীর নাম ধরে ডাকার অধিকার একটা কারা-পলায়িতা বন্দিনীর থাকতে পারে না। সুলতান! যে তোমার কারাগার থেকে গোপনে পালিয়েছিল, সেই বেইমানীকে তুমি এমন দণ্ড দাও—যার নাম শুনেই ও ভয়ে শিউরে উঠবে।

ইব্রাহিম। ছায়াবেগম!

ছায়া। এখনও সময় আছে, সংযত হও ইব্রাহিম। মা না হলেও মায়ের মত আমি তোমাকে মানুষ করেছি। একটা ভিখারিণীর মেয়ের কথায় আমাকে আর নির্য্যাতন করো না। নারীনির্যাতনকারীর ক্ষমা কোন যুগে কোন ধর্মের মধ্যে নেই। মায়ের সম্মান না দাও,

তোমার পিতার দ্বিতীয় পত্নীত্বের অধিকারে আমাকে স্বচ্ছন্দে আমার স্বামীর প্রাসাদে থাকতে দাও।

ইব্রাহিম। আমার পিতার বাঁদী হলেও আমি তোকে প্রাসাদে স্থান দিতাম। কিন্তু তুই সেকেন্দার শাহের তুচ্ছ একটা বাঈজী মাত্র। আমি চাই না যে একজন নাচনেওয়ালী আমার পিতার সাদী করা বেগম বলে পরিচয় দেয়। যা—দূর হ এখান থেকে।

ছায়া। ভুলে যেও না নির্ব্বোধ যে, এই ছায়াবেগমের করুণাতেই তুমি মানুষ হয়েছিলে।

রিজিয়া। ওঃ, অসহ্য! সুলতান! আমার সামনে একটা কসবী তোমাকে বার বার অপমান করবে?

ইব্রাহিম। রক্ষি! [রক্ষীর প্রবেশ] যা—একে কোতলখানায় নিয়ে যা। ঘাতককে বলবি, এর চোখ দুটো উপড়ে নিয়ে, তারপর এক একটি অঙ্গ ছেদন করে নির্মম ভাবে হত্যা করতে।

রক্ষী। চলে আসুন বিবিসাহেবা।

ছায়া। যাবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, যেতেই হবে। চোখের উপর স্বামীর অক্ষয় কীর্ত্তি ম্লান হয়ে যাবে—সে আমি সইতে পারবো না। শোন শয়তান! যাবার সময় আমিও বলে যাচ্ছি, সত্যই যদি এতটুকুও মাতৃস্নেহ দিয়ে থাকি, তাহলে আমাকে নির্যাতন করার অপরাধে তোর এই সুলতানীর স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। দিল্লীর পথ পার্শ্বে পড়ে মুমূর্ষু বেদনায় তুই আর্তনাদ করবি, তোর সেই বুকফাটা আর্তনাদ শুনে তোরই চোখের উপর তোর এই আদরের বেগম আনন্দে করতালি দেবে। সেদিন—সেদিন বুঝবি আমাকে নির্যাতন করার পরিণাম কত ভয়ংকর।

[রক্ষিসহ প্রস্থান।

রিজিয়া। তুমি ভয় পেও না সুলতান, ও বাঁদীর কথায় কিছুই হবে না।

ইব্রাহিম। ভয় থাকলে তোমাকে সাক্ষী করতে পারতাম না রিজিয়া।

রিজিয়া। সুলতান! আমার সব আশাই তুমি পূর্ণ করেছো। পারলে না শুধু একটা।

ইব্রাহিম। কি রিজিয়া?

রিজিয়া। হিন্দুস্থানের বুকে যে আমার চেয়েও একজন বেশী সুন্দরী আছে—এই আমার সবচেয়ে বড় আফশোষ।

ইব্রাহিম। কে সে?

রিজিয়া। এরই মধ্যে ভুলে গেলে? মেহের।

ইব্রাহিম। মেহেরকে এবার আমি বন্দিনী করে তোমার কাছে হাজির করবোই।

রিজিয়া। কবে? কবে আসবে সে শুভদিন?

ইব্রাহিম। কান টানলেই মাথা আসে রিজিয়া। আমি কান পাকড়েছি, মাথা এবার আসবেই।

রিজিয়া। অর্থাৎ?

ইব্রাহিম। মেহেরের সেই বুড়ো বাপটাকে আমি বেঁধে দিল্লীতে আনিয়েছি। আর প্রচার করে দিয়েছি—মেহেরকে না পেলে তার বাপকেই কোতল করবো।

রিজিয়া। মেহের আসবে?

ইব্রাহিম। আসতেই হবে।

রিজিয়া। তবে আমি হারেমে যাই জাঁহাপনা! ফৌজদের তৈরী হতে বলিগে, সে এলেই তাকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

ইব্রাহিম। তারপর?

রিজিয়া। আমি তাকে পুড়িয়ে মারবো জনাব! সে তার রূপের ডালি নিয়ে যখন পুড়ে মরবে, তখন আনন্দে হাততালি দেব। হা-হা-হা, ভারি মজা হবে!

[প্রস্থান।

ইব্রাহিম। মেহের—মেহেরকে চাই।

রেজা খাঁর প্রবেশ।

রেজা। এসেছে জনাব!

ইব্রাহিম। কে? মেহের?

রেজা। না, মেহেরের পিতা বৃদ্ধ কেরামৎ।

ইব্রাহিম। তা তো আমি জানি। তাকে নিয়ে এস—

কেরামতের প্রবেশ।

কেরামত। ভারত-সুলতান যে একটা মেয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়, এ আমি এই প্রথম দেখলাম।

ইব্রাহিম। আমিও প্রথম দেখলাম যে, একটা চাষী তার মেয়েকে ভারত-সুলতানের সঙ্গে সাদী দিতে সম্মত নয়।

কেরামত। একটা মানুষের কতগুলো সাদীর প্রয়োজন সুলতান?

ইব্রাহিম। সুলতানের ইচ্ছায় হাজার বেগম তার পদসেবা করবে।

রেজা। মেহেরকে তুমি দেবে না বৃদ্ধ?

কেরামত। না।

রেজা। যার রাজত্বে বাস করিস, তার হুকুম অমান্য করতে তোর শরম হয় না চাষি?

কেরামত। রাজত্বে বাস করি, তার জন্য খাজনা দিই, নজরানা দিই—

ইব্রাহিম। শুধু খাজনা? নজর?

কেরামত। আর কি চাই বল? সুলতানের প্রাপ্য খাজনা, নজর, প্রজার ঘরের বৌ-ঝি জোর করে নিকা করা নয়।

ইব্রাহিম। বল মেহের কোথায়?

কেরামত। বলবো না। মেহের আমার মেয়ে। সে কোথায় আছে না আছে, জোর করে সে খবর জানার তো'ার অধিকার নেই।

ইব্রাহিম। রেজা খাঁ, আমার হাতিয়ার—

রেজা। এই যে মেহেরবান! [হাতিয়ার দিল]

ইব্রাহিম। কেরামত! মেহেরকে চাই।

কেরামত। পাবে না।

ইব্রাহিম। ইব্রাহিম লোদীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করবার ক্ষমতা স্বয়ং খোদারও নেই।

কেরামত। খোদার নেই, কিন্তু মানুষের আছে। খোদা নিরাকার, কিন্তু মানুষ সাকার।

ইব্রাহিম। [নৃশংস হাস্য] হা-হা-হা! মর তবে বেইমান— [কেরামতকে অস্ত্রাঘাত]

কেরামত। ওঃ! খোদা!

মেহেরের প্রবেশ।

মেহের। বাবা—বাবা—

কেরামত। মেহের—মা—ওঃ!

মেহের। বাবা! একি, রক্ত।

ইব্রাহিম। মেহের, তুমি মেহের? হ্যাঁ, সুন্দরী বটে! দুঃখ করো না হুরি! আমি তোমাকে আশমানের চাঁদ এনে দেব।

মেহের। [উন্মাদিনীর মত] তোমার কি মা বোন নেই ইব্রাহিম লোদি! গায়ে কি তোমার গণ্ডারের চামড়া? মনটা কি তোমার পাথর দিয়ে গড়া? ওরে জল্লাদ! ওরে শয়তান! ভেবেছিস ওইসব নাচনেওয়ালীদের মত আশরফির জন্য মেহের তোর পশুত্বের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেবে? না—না, মেহের মরবে, কিন্তু মরবার আগে তোর বুকে সে দাঁত বসিয়ে দিয়ে যাবে।

ইব্রাহিম। বাঃ! তোমাকে রাগলেও ভাল দেখায়, কাঁদলেও ভাল দেখায়, হাসিতেও তোমার মুক্ত ঝরে পড়ে। এস, কাছে এস—

মেহের। কাছে যাব—তবে শুধু নয়। বুকে নিয়ে যাব জ্বালা, মুখে নিয়ে যাব গরল, চোখে নিয়ে যাব প্রতিহিংসার নেশা। আয় —আয়, এগিয়ে আয় পশু!

ইব্রাহিম। এস পিয়ারি, এস— [মেহেরকে ধরিতে উদ্যত]

সহসা ঝড়ের মত আলম খাঁ আসিয়া বাধা দিল।

আলম। খবরদার শয়তান! মেহেরকে স্পর্শ করলে আমি তোকে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। [মেহের ও ইব্রাহিমের মধ্যস্থলে দাঁড়াইল]

ইব্রাহিম। কেন? মেহেরের ওই ডাগর চোখ দুটো দেখে আলম চাচার মনটা বুঝি গলে গেছে? রেজা খাঁ,— [রেজাখাঁকে ইঙ্গিত করিলেন, রেজা খাঁ বিদ্যুৎ গতিতে আলম খাঁর অসতর্ক মুহূর্তে তাহার হাতে শৃংখল পরাইয়া দিল]

আলম। [সাশ্চর্য্যে] এ কি!

ইব্রাহিম। বকশিস! এই, কে আছিস?

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। আমি আছি মেহেরবান।

ইব্রাহিম। যা—এই ছোটলোক চাষীটাকে নিয়ে যা। এর অর্দ্ধমৃত দেহটা কেটে রান্না করতে বলবি।

বান্দা। সুলতান!

ইব্রাহিম। হ্যাঁ—ওর মাংস দিয়েই আমি মেহেরকে খানা খাওয়াবো, অবশ্য আলম চাচা সঙ্গে থাকলে, একটু পেতেও পারে।

আলম। বেইমান!

ইব্রাহিম। মানুষের মাংস কি না, খেতে খুব মিষ্টি লাগবে।

মেহের। [কেরামতকে ধরিয়া] বাবা—বাবা!

কেরামত। ভয় কি মা! আমি গেলেও তোর আশ্রয়দাতা পিতা আছেন। তিনিই তোকে উদ্ধার করবেন। ওঃ, দেহটা যেন অবসন্ন হয়ে আসছে। ওঃ, মেহের! একবার তোর মুখখানা আমার চোখের উপর নিয়ে আয় তো মা! ভাল করে দেখি।

মেহের। বাবা!

কেরামত। ওঃ—মেহের! তুই আমার মেহের। হ্যাঁ, অনেক দিন আগেকার কি যেন একটা রক্তমাখা ছবি আমার মনে উঁকি মারছে। সেই কুয়াসাবৃত অন্ধকারের মাঝে দেখতে পাচ্ছি—দিল্লীর রাজপথের পাশে একটা শুকনো কংকালসার প্রাণহীন দেহ—তার পাশে কেঁদে বুকভাসান দুটো মেয়ে, তার একটাকে—ওঃ—না, আর হল না। কথাগুলো যেন সব খেই হারিয়ে যাচ্ছে—দুনিয়ার সমস্ত

অন্ধকার যেন আমার সামনে নেমে এসেছে। আর হল না মা—

মেহের। ওঃ! ওগো হিন্দুর ভগবান—মুসলমানের খোদা, তুমি কি মরেছো?

ইব্রাহিম। যা বান্দা! নিয়ে যা—

বান্দা। আমি—আমি পারবো না জাঁহাপনা!

ইব্রাহিম। বান্দা!

বান্দা। যে মানুষের মাংস মানুষকে খাওয়াতে চায়, তার গোলামী আমি আর করবো না।

রেজা। কি বলছিস নফর?

বান্দা। তোমার মত নফর তা বুঝতে পারবে না রেজাখাঁ! তোমার সঙ্গে আমার অনেক প্রভেদ! তুমি গোলামী করছো মনুষ্যত্বের খোলস পুড়িয়ে খেয়ে, আর আমি গোলামী করছি—মনুষ্যত্বটাকে বুকে আঁকড়ে নিয়ে। তাই আমার মত নফরের কথা তোমার মাথায় ঢুকবে না ভাই।

ইব্রাহিম। বান্দা! শয়তান—

বান্দা। আপনার মত সুলতানের কাছে বান্দাগিরি করার চেয়ে ভিখারীর মজুরখাটাও অনেক ভাল।

ইব্রাহিম। আপাততঃ আমার হুকুম তামিল কর। চাকরীতে ইস্তফা দেওয়ার পর তোকে আর কিছু বলবো না।

বান্দা। মনে রাখবেন সুলতান! বান্দার গোলামী করার ভিত আজ থেকেই আলগা হয়ে গেল! [কেরামতকে] এস ভাই,—

মেহের। না-না, আমার বাবাকে আমি কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবো না।

কেরামত। যাবার ডাক এলে কেউ তাকে রাখতে পারবে না

মেহের। ওরে, তুই খোদাকে ডাক।

আলম। ইব্রাহিম! তুমি আমাকে হত্যা কর, বিনিময়ে এই বৃদ্ধের অর্দ্ধমৃত দেহটা ভিক্ষা দাও।

ইব্রাহিম। যা, নিয়ে যা—

মেহের। বাবা!

কেরামত। ওরে, বড়লোকের দুনিয়ার গরীবের জীবনের কোন মূল্য নেই। ওঃ, খোদা! মরার আগে তোমার কাছে আমার শেষ আর্জি, রূপ যদি দিতে হয় ওই ধনীর ঘরেই দিও—গরীবের ভাঙা কুঁড়ে ঘরে রূপের আলো ছড়িয়ে দিও না মেহেরবান।

[বান্দাসহ প্রস্থান।

মেহের। ওরে, দুনিয়ায় কি এমন কেউ নেই, যে এই অত্যাচারীর প্রাসাদটাকে চুরমার করে আমার বাবাকে উদ্ধার করে? বাবা—বাবা! ওঃ—

আলম। মেহের,—

ইব্রাহিম। মেহেরকে আমি তোমায় দেব আলম খাঁ, তবে আজ আজ নয়, দুদিন পরে। যেদিন ওর ওই ডালিমের মত মুখখানা সাদা হয়ে যাবে, ডাগর দুটি চোখ কালির রেখায় ভরে যাবে, যেদিন ওর ওই পাগল-করা রূপ কদর্যতায় পরিণত হবে—সেদিন। আজ নয়।

আলম। আমিও তোমাকে বলে রাখছি ইব্রাহিম! মানুষের কাতর আর্তনাদ নারীর চোখের জল পীড়িতের অভিশাপ কখনও ব্যর্থ হয় না—হবে না। তোমারও মৃত্যু আসছে—তুমিও প্রস্তুত হও।

ইব্রাহিম। তোমার আগে ইব্রাহিম লোদী মরবে না আলম খাঁ! রেজা খাঁ!

রেজা। জাঁহাপনা!

ইব্রাহিম। যাও—এই জানোয়ারটাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাও। তিনদিনের মধ্যে আমি ওকে কোতল করবো।

রেজা। চলে এসো আলম খাঁ!

মেহের। আলম খাঁ! তুমিও যাচ্ছো?

আলম। না মেহের! আলম খাঁ যেদিন মরবে, সেদিন পদাঘাতে ওই শয়তানটার বুকখানা চূর্ণ করে দিয়েই যাবে। তুমি ভেবো না মেহের। আপাততঃ কৌশলে আমায় বন্দী করলেও, এ বন্দিত্ব আমার ক্ষণস্থায়ী। ভারতের চারদিকে আজ বিদ্রোহের আগুন জলে উঠেছে, দিল্লীর জনাকীর্ণ মহানগরীর বুকেই সৃষ্টি হচ্ছে ইব্রাহিমের ধংসস্তূপ, হিন্দুস্থানের মাটি ভেদ করে তারস্বরে বেরিয়ে আসছে মিলিত হিন্দুমুসলমানের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। ভয় নেই মেহের, তোমার আমার মুক্তির সঙ্গেই নেমে আসবে ওই বর্বর সুলতানের ঘৃণিত জীবন-নাট্যের শেষ যবনিকা।

[রেজা খাঁ সহ প্রস্থান।

ইব্রাহিম। সব যাক—তবু আমি তোমাকে ছাড়বো না মেহের। এস, পাশে এস। হীরা জহরৎ মসনদ—তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে দেবো, এস— [মেহেরের দিকে অগ্রসর]

মেহের। [পিছাইয়া গেল] লম্পট!

ইব্রাহিম। [কিছু অগ্রসর হইয়া] মেহের,—

মেহের। [পিছাইয়া] জল্লাদ!

ইব্রাহিম। [নিকটস্থ হইয়া] মেহের,—

মেহের। [পিছাইয়া] নরঘাতক—দস্যু—

ছুটিয়া বিক্রমজিতের প্রবেশ।

বিক্রম। হয়ে গেল—সব হয়ে গেল! একি—জনাব!

ইব্রাহিম। কি হয়ে গেল রায় মশাই?

বিক্রম। হয়ে গেল, আপনারও হয়ে গেল আর আমারও হয়ে গেল।

ইব্রাহিম। হেঁয়ালী রেখে কথাটা বলুন।

বিক্রম। বলছি, পাঞ্জাব তো গেছেই, এইবার দিল্লীও যাবে।

ইব্রাহিম। [উত্তেজিত হইয়া] কোথায় গেছে পাঞ্জাব?

বিক্রম। জাহান্নামে গেছে!

ইব্রাহিম। [সগর্জ্জনে] কি বলছেন আপনি?

বিক্রম। [ক্রন্দনের সুরে] বলতে কি পারতাম জনাব! নেহাৎ দয়া করে ছেড়ে দিয়েছে তাই। ও-হো-হো, ওদিকে দৌলত বেচারীর যে কি হল, কে জানে।

ইব্রাহিম। কি হয়েছে দৌলত খাঁর?

বিক্রম। যুদ্ধ করে হেরে গিয়ে গোবেচারীর মত বন্দী হয়েছে জনাব।

ইব্রাহিম। কার হাতে?

বিক্রম। কাবুল-সম্রাট বাবরের হাতে।

ইব্রাহিম। বাবর!

বিক্রম। তবে আর বলছি কি? পাঞ্জাব তো নিয়েছে, আবার দৌলত খাঁকেও বন্দী করেছে। আমাকেও করেছিল, শুধু দয়া করে ছেড়ে দিয়েছে সংবাদটা আপনাকে দেবার জন্য।

ইব্রাহিম। কিসের সংবাদ?

বিক্রম। আজ্ঞে, যুদ্ধের সংবাদ। তিন দিনের মধ্যে সে নাকি দিল্লীতেও আসবে।

মেহের। [স্বগত] কবে আসবে সে শুভদিন? কবে আমি ইব্রাহিমের তাজা রক্তে সাঁতার দেব? কবে প্রকাশ্য রাজপথে আমি ওর মৃত দেহটাকে টুকরো টুকরো করে শিয়াল শকুনকে দিয়ে খাওয়াবো। কবে আমার মত ওর বেগমদের চোখের জলে আর কান্নার আর্তনাদে ভরে যাবে এই প্রাসাদপুরী? কবে? কবে খোদা?

ইব্রাহিম। কাবুল-সম্রাট বাবর ঝড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে পাঞ্জাব অধিকার করলে—সুলতান ফৌজরা কি সেখানে ঘুমিয়েছিল?

বিক্রম। আজ্ঞে, সুলতানী ফৌজদের কোন দোষ নেই। তারা প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু বাবরের গোলার সামনে তারা দাঁড়াতেই পারলো না। জনাব! বাবর আমাকে বলে পাঠিয়েছেন—

ইব্রাহিম। কি বলে পাঠিয়েছে?

বিক্রম। তিন দিনের মধ্যে দিল্লীতে এসে আপনাকে বন্দী করে আপনার গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে তার ছেলের জুতো বানিয়ে দেবে।

ইব্রাহিম। চোপরাও বেয়াদব!

বিক্রম। আজ্ঞে, কথাটা বলেছে বাবর।

ইব্রাহিম। এই, কে আছিস?

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। কি হুকুম জনাব?

ইব্রাহিম। মেহেরকে নিয়ে যা—একে আমার হারেমে বন্দিনী করে রাখবি।

রক্ষী। যো হুকুম মালিক!

মেহের। [স্বগত] বাবর আসছে—ইব্রাহিম লোদী মরবে, তার গায়ের চামড়ায় জুতি তৈরী হবে, আমার মত নির্যাতিতা গরীবের দল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে। যদি এ সত্য হয়, তাহলে জানবো খোদা মিথ্যা নয়, হিন্দুর ঠাকুর মুসলমানের আল্লাও মিথ্যা নয়—দুনিয়ার বুকে অত্যাচারীর সাজা দেওয়ার শক্তি দীন দুনিয়ার মালিকের আছে।

[রক্ষী সহ প্রস্থান।

ইব্রাহিম। যান রায়মশায়! সিপাহশালারকে আমার হুকুম জানিয়ে অবিলম্বে দরবারে হাজির হতে বলুন গে—

বিক্রম। যে আজ্ঞে। [স্বগত] হয়ে গেল। পাঠানেরও হয়ে গেল—আমারও গোয়ালিয়র আর পাঞ্জাবের সুবেদারী করা জন্মের মত ঘুচে গেল! হে মা দুর্গা! তোমার অধম সন্তানকে তুমিই দেখো মা—তুমিই দেখো—

[প্রস্থান।

ইব্রাহিম। বিদেশী আফগান ফৌজকে আমি পাঞ্জাবের মাটিতে কবর দেবো। [প্রস্থানোদ্যত]

গীতকণ্ঠে ফকির সাহেবের প্রবেশ।

ফকির।—

গীত।

তোমার মিছেই অহংকার।
জীবন-সূর্য ডুবিবে অকালে আসিবে অন্ধকার।

দুনিয়ার সেরা তুমি বেইমান,
মাফ নাই তোমার, পাবে না ইনাম,
খোদার বিচারে সকলই হারায়ে ফেলিবে অশ্রুধার ॥
তুমি যাবে বলে অতলের তলে পড়িয়াছে সাড়া তাই,
দিকে দিকে বাজে মরনের ভেরী
কান পেতে শোন নাই ?
পাপের প্রাসাদ তব মিশিবে ধুলায়, রবে না স্মৃতিটি তার।

ফকির। বাবর এসেছে ইব্রাহিম, আর তোমার রক্ষা নাই।

[প্রস্থান।

ইব্রাহিম। বাবর! কাবুল-সম্রাট বাবর এসেছে ভারত লুণ্ঠন করতে! চেঙ্গিসের তৈমুরলঙের পুনরাভিনয় ? না না, ইব্রাহিম লোদী জীবিত থাকতে মোগলের আধিপত্য কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। লুণ্ঠনকারী তস্করদের কামানের ভয়ে পাঠানের গর্বিত বিজয় নিশান মোগলের পায়ে লুণ্ঠিত হতে দেবে না। তামাম হিন্দুস্থানের বুকে আমার আধিপত্যকে আমি বুক দিয়ে রক্ষা করবো। আসুক মোগল —করুক তোপধ্বনি—বাজাক মরণভেরী, আমি কাঁপবো না—টলবো না, হিমালয়ের মত ধৈর্য নিয়ে প্রতিহত করবো সে আঘাত, মুছে দেবো দুনিয়ার মাটি থেকে ওই লুণ্ঠনকারী মোগল জাতির নাম।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অংক।

প্রথম দৃশ্য।

মোগল-শিবির।

হুমায়ুন বসিয়াছিলেন। নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

আলোর ঝর্ণা ধারায়—
গেয়ে যাবো গান, দিয়ে মন প্রাণ
সিনান করাবো তোমায়।
আধ আলো আর আধ জোছনায়,
হেনার গন্ধে ভরা এই আঙিনায়
বাসর করিয়া বঁধু, সাজাবে তোমায়—
দেওয়া আর নেওয়া স্রোতে ভাসিব যে হায়।

হুমায়ুন। এরাই নাকি ভারতের সেরা নাচনেওয়ালী! আরে দূর দূর! না আছে রূপ—না আছে গুণ, জানে শুধু নয়না হেনে মুঠো মুঠো আশরফি আদায় করতে। যাও, দূর হও—[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান] তবে হ্যাঁ, কিছু না থাকলেও ভারতে একটা জিনিষ আছে। এদেশের মানুষগুলো আফগানের মত গোঁয়ার নয়। নরম কথায় খোষামোদ করে মালিকের মন রাখতে এরা জানে। মালিকের মনোরঞ্জন করতে প্রয়োজন হলে নিজের ভাই এর বুকে ছুরি বসাতে এরা পারে।

নেপথ্যে। [কামান-গর্জ্জন]

হুমায়ুন। ওকি!

বাবরের প্রবেশ।

বাবর। হুমায়ুন,—

হুমায়ুন। পিতা!

বাবর। আর এখানে নয় পুত্র! ছাউনী তোল, এখনি দিল্লী রওনা হতে হবে।

হুমায়ুন। এখনি যাত্রা করবেন?

বাবর। হ্যাঁ, এখনি। ইব্রাহিম লোদী আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করে পাঠিয়েছে।

হুমায়ুন। কোথায় পিতা, তার প্রাসাদে?

বাবর। না পুত্র, পাণিপথের মাঠে।

হুমায়ুন। পাণিপথ?

বাবর। হ্যাঁ, পাণিপথের মাঠেই সে আমার সঙ্গে শক্তির প্রতিযোগিতা করতে চায়।

হুমায়ুন। পিতা! পাঠান-সুলতানের সঙ্গে—

বাবর। পাণিপথের মাঠেই হবে মোগলের ভাগ্যপরীক্ষা পুত্র! গুপ্তচর মুখে সংবাদ পেলাম, পাঠান সৈন্য জলস্রোতের মত পাঞ্জাবের দিকেও ছুটে আসছে—অর্দ্ধ পথে তাদের গতিরোধ করতে না পারলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

হুমায়ুন। তার জন্য চিন্তা কি পিতা! আমি এখনি দিল্লীর পথে যাত্রা করছি।

বাবর। শুধু যাত্রা নয়, মনে রেখো হুমায়ুন, তুমি বাবরের পুত্র!

হুমায়ুন। পিতা!

বাবর। ভারতের এই বিশাল শক্তিকে বিধ্বস্ত করতে না পারলে ভারত জয় আমার অসমাপ্তই থেকে যাবে।

হুমায়ুন। না পিতা! আমার মন বলছে—অদূর ভবিষ্যতে ভারতের মাটিতে মোগলের বিজয় দুন্দুভি বেজে উঠবেই।

বাবর। তা যদি হয় পুত্র! ছলে বলে কৌশলে যদি ওই পাঠানশক্তিকে দমিত করতে পারো, তাহলে ভারতের মসনদে আমি তোমাকেই বসাবো।

হুমায়ুন। আপনি?

বাবর। আমি কাবুলের শের, কাবুলেই ফিরে যাবো। কাবুলের উত্তপ্ত মরুভূমি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আঙুর আর খরমুজের বন, সীমাহীন আশমানের তলে খোদার সৃষ্টি আফগানী মরূদ্যান আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে পুত্র! ভারতে সহস্র ঐশ্বর্য পেলেও আমার জন্মভূমিকে আমি ভুলতে পারবো না।

হুমায়ুন। আমি আপনার কাছে শপথ করছি পিতা, মৃত্যুভয়ে হুমায়ুন কখনও রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে আসবে না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে শিবিরে অপেক্ষা করুন।

বাবর। হুমায়ুন!

হুমায়ুন। আমি আমার হাজার হাজার খোরাসানী ফৌজ নিয়ে চললাম পিতা! পাণিপথ অতিক্রম করার পূর্বেই পাঠানসৈন্যদের তোপের মুখে উড়িয়ে দেবো।

[প্রস্থান।

বাবর। পাণিপথ—পাণিপথ! বল রাক্ষসী! তোর বুকে কাল-ঘুমে ঘুমিয়ে পড়বে কে? আমি—না ওই অত্যাচারী পাঠান-সম্রাট?

গীতকণ্ঠে ফকির সাহেবের প্রবেশ।

ফকির।—

গীত।

যদি ভাসায়ে দিয়েছো দরিয়ায় না,
কেন ভাবিছ বসিয়া আজ ?
যদি আসে ঝড়, নামে গো তুফান, পড়ে শিরে তব বাজ—
টলিও না কভু, কাঁপিও না বীর,
বহে যদি তব শত আঁখিনীর
আসিবে বিজয় নসীবে তোমার শিরে যে পরাবে তাজ।

বাবর। ফকির সাহেব! আমি তো মানুষ। তাই মাঝে মাঝে চিন্তা হয়—

ফকির। কেন চিন্তা ? কিসের ভয় ? এগিয়ে চল বীর! এগিয়ে চল—

[প্রস্থান।

বাবর। এই আশায় বুক বেঁধেই আমি দরিয়ায় তরী ভাসিয়েছি বন্ধু! শত ঝঞ্ঝা সহস্র তুফানেও আমার মনোবলকে চূর্ণ করতে পারবে না।

দৌলত খাঁর প্রবেশ।

দৌলত। মোগল-সম্রাট! পরাজিত দৌলত খানকে এভাবে আর কতদিন তোমার বন্দিত্ব স্বীকার করে থাকতে হবে ?

বাবর। যতদিন না আমার ভারতজয় সম্পূর্ণ হয়।

দৌলত। তার চেয়ে তুমি আমাকে হত্যা কর।

বাবর। দৌলত খান!

দৌলত। ভেবেছিলাম অত্যাচারের অবসানে তোমার সাহায্য নেওয়া আমার বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু এখন দেখছি, আমি যে ভুল করেছি, তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

বাবর। ভারত আক্রমণে তুমি আমাকে সাদর আহ্বান করে যে উপকার করেছো, তা আমি কোন দিনই ভুলবো না দোস্ত! তবে আপাততঃ আমার এবং তোমার মংগলের জন্য নজরবন্দী থাকাই তোমার পক্ষে শুভ।

দৌলত। তোমার মত বিশ্বাসঘাতক বেইমানের কথায় আর ভুলবো না সম্রাট!

বাবর। বেইমান? মোগল-সম্রাটকে তুমি চেনো না দৌলত খান। যে মুহূর্তে তোমার ওই কলুষিত রসনা আমাকে বেইমান আখ্যা দিয়েছে, সেই মুহূর্তেই আমি তা ছেদন করে ফেলতাম। শুধু বেঁচে গেলে তমি আমার উপকারী বলে। যাও দৌলত খান! তোমাকে যতই দেখছি ততই আমার আত্মসংযমের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে! ভবিষ্যতে হয়তো—

দৌলত। হত্যা করবে?

বাবর। হয়তো তাই। বাবর সব সইতে পারে, কিন্তু দোস্ত, তোমার মত মূষিকের মুখে বীরত্বের আস্ফালন, এ অসহ্য। [প্রস্থান।

দৌলত। ভুল করেছি—ভুল করেছি। না না, এ ভুলের সংশোধন করতেই হবে। যেমন করেই হোক মোগলের বন্দিত্ব থেকে আমাকে মুক্তি নিতেই হবে। তারপর ভারতের সমস্ত খণ্ড খণ্ড হিন্দু মুসলিম রাজ্যগুলিকে একত্রীভূত করে তাদেরই সাহায্যে এই মোগল-শক্তিকে প্রতিহত করে আফগানের বুকে ফিরিয়ে দিতে হবেই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কারাগার ।

আলম খাঁ ।

আলম । ওঃ, আর যে সহ্য করতে পারি না খোদা ! আজ তিন দিন পানি নেই, খানা নেই, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, বাঁচতে আমার এতটুকু ইচ্ছা নেই, কিন্তু তবুও মরতে পারছি না শুধু মেহেরের জন্ত । আমি তাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম উদ্ধার করবো— সে আশাও বুঝি আমার ব্যর্থ হয় । ওঃ, খোদা ! একটু পানি দাও মেহেরবান !

রিজিয়ার প্রবেশ ।

রিজিয়া । পানি খাবে আলম খাঁ ?

আলম । বেগম সাহেবা ! তুমি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করছো ?

রিজিয়া । না দোস্ত ! আমি তোমাকে পানি দিতে চাই, তবে—

আলম । তবে কি ? বল—বল ?

রিজিয়া । যদি তুমি আজ রাতেই আমাকে নিয়ে দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে যেতে পার ।

আলম । [চমকিত হইয়া] বেগম সাহেবা ।

রিজিয়া । রিজিয়া নারী আলম খাঁ ! অন্যান্য নারীর মত তার অন্তরেও ভালবাসা আছে—প্রেম আছে ।

আলম । রিজিয়া !

রিজিয়া। হীরা জহরৎ মসনদ—এ নিয়ে আমার নারীত্বের অভাব পূর্ণ হবে না আলম। ছায়া বেগমের উপর প্রতিশোধ নিতে ওই মনুষ্যত্বহীন ইব্রাহিমের কাছে আমি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি সত্য, কিন্তু তাকে ভালবাসতে পারিনি।

আলম। [বিরক্ত ভাবে] রিজিয়া!

রিজিয়া। এতদিন ঐশ্বর্যের অহংকারে আর প্রতিশোধের নেশায় আমি আত্মহারা হয়েছিলাম, তাই মুখে কপট হাসি হেসে ইব্রাহিমকে ভুলিয়েছি। কিন্তু নিজের প্রাণের অভাব পূর্ণ করতে পারিনি। আলম খাঁ! বল—বল তুমি আমার সে অভাব পূর্ণ করবে?

আলম। ওঃ, খোদা! একথা শোনাও আমার মহাপাপ। [কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান]

রিজিয়া। তুমি পুরুষ, আমি নারী; তুমি সুন্দর, আমি সুন্দরী; তুমি যুবক, আমি যুবতী; চল চল, কোন এক নির্জন পল্লীতে গিয়ে দুজনে সুখের সংসার পাতবো।

আলম। [স্বগত] ওগো দীন দুনিয়ার মালিক! একটা বজ্র একটা ভূমিকম্প অথবা একটা প্রলয় ঝঞ্ঝায় তোমার এই পাপে ভরা দুনিয়াকে চূর্ণ কর মেহেরবান!

রিজিয়া। আলম খাঁ। আমি তোমার বাঁদি হয়ে থাকবো, তবু ওই পশু ইব্রাহিম লোদীর বেগম হয়ে থাকতে আর চাই না। তুমি যদি চাও, যে কোন মুহূর্তে আমি ওই শয়তানটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে তোমাকেই ভারতের মসনদে বসাতে পারি।

আলম। ভারতের মসনদ আমি চাই না রিজিয়া!

রিজিয়া। বল কি চাও তুমি?

আলম। আমি তোমাকেই চাই।

রিজিয়া। [সাগ্রহে] চাও? ওঃ, খোদা! তুমি মেহেরবান। আবার বল আবার বল আলম খাঁ! "রিজিয়া, আমি তোমাকেই চাই।"

আলম। রিজিয়া, আমি তোমাকেই চাই।

রিজিয়া। [ভাবাবেশে] আলম খাঁ!

আলম। রিজিয়া!

রিজিয়া। [বিহ্বল হইয়া] আলম খাঁ! তুমি আমাকে চাও?

আলম। চাই—ঠিক মায়ের মত তোমাকে আমি আমার কাছে পেতে চাই।

রিজিয়া। আলম খাঁ! শয়তান!

আলম। বল, সন্তান। তুমি যে মায়ের জাতি রিজিয়া! মুক্ত-কণ্ঠে বল, ওরে আলম, ওরে আমার মাতৃহারা পুত্র, আয়—আমার বুকে আয়, আমিও সমস্ত সংকোচকে দূরে সরিয়ে দিয়ে দ্বিধাশূন্য চিত্তে অবোধ সন্তানের মত "মা-মা" বলে তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। দেখবে মা, দুনিয়ায় স্বর্গ বলে যদি কোথাও কিছু থাকে, সে নেমে আসবে তোমার আর আমার মাঝে।

রিজিয়া। বান্দা! পানি নিয়ে আয়, আলম খাঁকে আজ আমি জন্মের মত পানি খাইয়ে যাবো।

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। সে পানি আমি ফেলে দিয়েছি বেগম সাহেবা!

রিজিয়া। বান্দা!

বান্দা। আমি জানি, ও পানি নয়, বিষ। আমার সামনে একজন নিরপরাধ মানুষকে আপনি বিষ খাইয়ে হত্যা করবেন, এ আমি সইতে পারবো না বেগম সাহেবা।

রিজিয়া। বান্দা, আমি তোর গর্দান নেবো।

বান্দা। যদি প্রয়োজন হয়, বলে পাঠাবেন, আমি কেটে পাঠিয়ে দেবো। আসি—আদাব।

রিজিয়া। কোথা যাস নিমকহারাম?

বান্দা। আমার পাতার কুটিরে বেগম সাহেবা! গোলামীর নেশা আজ আমার কেটে গেছে। জেনে রাখুন—আমরা গরীব, পেটের দায়ে আপনাদের মত বড় লোকের দাসত্ব করি, কিন্তু মানুষ হয়ে আর একজন মানুষের বুকে দাঁত বসিয়ে দিতে পারি না।

রিজিয়া। বান্দা!

বান্দা। আপনাদের সোনার শিকলে বন্দী হয়ে মনুষ্যত্বকে চিবিয়ে খাওয়ার চেয়ে, আমার নিরন্ন পর্ণকুটিরে বসে স্বাধীন জীবনে মানুষের সেবা করা অনেক ভাল। তাতে সংসারের অভাব না ঘুচলেও মনের অভাব থাকবে না।　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

রিজিয়া। এ শয়তানকে আমি জীবন্ত পুড়িয়ে মারবো। আলম খাঁ! পানি খাবে না?

আলম। খাবো—যদি মায়ের মত তুমি আমাকে—

রিজিয়া। থাম বন্দী! তুমি রিজিয়াকে দেখেছো—দেখনি তার কালনাগিনী মূর্তি,—এইবার দেখবে।

[প্রস্থান।

আলম। [উদ্দেশ্যে] এর চেয়ে আরও কি মূর্তি তুমি দেখাবে নারী?

জলপাত্রহস্তে মেহেরের প্রবেশ।

মেহের। আলম খাঁ!

আলম। তুমি এসেছো মেহের? কিন্তু কেমন করে এলে?

মেহের। সে কথা পরে শুনবে, আগে এই পানিটুকু খেয়ে নাও।

আলম। পানি? তুমি আমার জন্ম পানি এনেছো মেহের?

মেহের। আমি জানি, এরা আজ তিনদিন তোমাকে কিছুই খেতে দেয়নি। নাও পানিটুকু খেয়ে নাও।

আলম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে পানি খেতেই হবে—আমাকে বাঁচতেই হবে। দাও মেহের, পানি দাও— [মেহেরের নিকট হইতে জলপাত্র লইয়া মুখে তুলিতে গেল]

সহসা রেজা খাঁ আসিয়া জলপাত্র কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিল।

রেজা। প্রেয়সীর দেওয়া পানি কবরে বসে খেও আলম খাঁ!

আলম। [ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হইয়া] রেজা খাঁ!

রেজা। হা-হা-হা! বড় ব্যথা পেলে আলম খাঁ!

মেহের। রেজা খাঁ! ক্ষুধার্ত পিপাসিত কয়েদীর মুখে একটু পানি দিতেও দিলে না শয়তান! ওরে মনুষ্যত্বহীন হিংস্র জানোয়ার, ভেবেছিস—এদিন তোদের এমনিই যাবে? না না, খোদার বিচারে এমন সাজা তোরা পাবি, যা দেখে দুনিয়ার মানুষ আতংকে শিউরে উঠবে।

রেজা। রেজা খাঁকে ভালবাস মেহের! সে তোমাকে দুনিয়ার ঐশ্বর্য দিয়ে সাজিয়ে দেবে।

মেহের। রেজা খাঁকে মেহের ভালবাসবে সেদিন, যেদিন তার দেহে প্রাণ থাকবে না। সরে যা—সরে যা শয়তান! অন্ধকার কারায় বসে আমাদের একটু কাঁদতে দে।

রেজা। গোপন কারায় বসে প্রেমালাপ বেশ ভাল জমে, না মেহের?

আলম। [সগর্জনে] রেজা খাঁ! দ্বিতীয়বার ওই অশ্লীল কথা তোমার মুখে শুনলে, আমি পদাঘাতে মুখখানা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবো।

রেজা। ওঃ—এখনও এত দম্ভ? মর তবে বেইমান! [আলম খাঁকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

মেহের। [রেজা খাঁর অস্ত্রের সামনে আসিয়া] আমাকে আগে হত্যা কর রেজা খাঁ! তারপর—

আলম। না! না, রেজা খাঁ, তুমি আমাকেই হত্যা কর। বাঘের মত দেহে শক্তি থাকতেও নিরস্ত্র বন্দী হয়ে চোখের সামনে নারী-হত্যা আমি দেখতে পারবো না। তুমি আমাকে হত্যা কর।

মেহের। আমাকে মরতে দাও আলম খাঁ! তুমি পুরুষ, আমার চেয়ে তোমার জীবনের দাম অনেক বেশী। তোমাকে বাঁচতে হবে, যেমন করেই হোক কারামুক্ত হতে হবে, এই সব মানুষরূপী জানোয়ার গুলোকেও একদিন সাজা দিতে হবেই। তোমাকে এত সহজে মরলে চলবে না বীর! আমাকে মরতে দাও—

আলম। না মেহের! জীবনের সায়াহ্নে রক্তিম আভায় নবোদিত সূর্যের আশা করা বৃথা। আমি মরতেই চাই—তোমার আগে—বাধা দিও না। রেজা খাঁ, তোল তলোয়ার—

মেহের। না, রেজা খাঁ! আমার অনুরোধ, আলম খাঁর আগে তুমি আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দাও—

রেজা। তুমি বাঁচবে মেহের! মরবে আলম খাঁ! খোদাকে স্মরণ কর বন্দী— [তলোয়ার উত্তোলন]

সহসা ছদ্মবেশে রহমৎ আসিয়া বাধা দিল।

রহমৎ। খোদাকে তুমি স্মরণ কর নফর!

রেজা। [চমকিত হইয়া] কে ?

রহমৎ। মানুষ।

রেজা। মর বেইমান— [আক্রমণ]

[রহমৎ ও রেজা খাঁর যুদ্ধ ; রেজা খাঁর পরাজয়]

রহমৎ। এইবার ?

সশস্ত্র ইব্রাহিম লোদীর প্রবেশ।

ইব্রাহিম। এইবার তোমাকেই শির দিতে হবে নফর।

রহমৎ। সুলতান !

ইব্রাহিম। চুপ— [অস্ত্রাঘাত ; রহমতের তরবারি পড়িয়া গেল] রেজা খাঁ ! এই ছদ্মবেশী গুপ্তচরটাকে বন্দী কর।

রেজা। গুপ্তচর ?

ইব্রাহিম। রাণা সংগ্রাম সিংহের চর এই শয়তান ! একে বন্দী করে নিয়ে যাও। আমি এর মাথাটা কেটে মেবারে পাঠিয়ে দেবো।

রেজা। [রহমতকে বন্দী করিয়া] চলে আয় বেকুব !

রহমৎ। চল নফর ! মৃত্যুর গহ্বরে যখন গলা বাড়িয়ে দিয়েছি, তখন বাঁচার আশা আমার নেই।

মেহের। রহমৎ !

রহমৎ। মেহের ! মহারাণার আদেশে আমি এসেছিলাম তোকে মুক্ত করতে, কিন্তু হলো না বহিন ! তবে যাবার সময় আমি তোকে অনুরোধ করে যাচ্ছি, যদি কোন দিন খোদার দোয়ায় মুক্তি পাস ভাল, আর না হয় হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করিস—তবু এদের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিস না।

[রেজা খাঁ সহ প্রস্থান।

ইব্রাহিম। আলম চাচা! তুমি যাও, আজ রাতের মত বিশ্রাম করে নাও, কাল সকালেই তোমাকে শির দিতে হবে।

আলম। আজ রাতে নিলেই ভাল হতো ইব্রাহিম! এসো মেহের—

ইব্রাহিম। না না, মেহের কোথা যাবে? ওযে আমার চোখে আশমানের চাঁদ। ওকে আমি অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেবো না। যাও—তুমি যাও—

আলম। ইব্রাহিম! তোমাকে অনুরোধ করা বৃথা জানি, তবু বলে যাচ্ছি, যদি পার, এই নারীর পায়ের তলায় মা—মা বলে মাথাটা লুটিয়ে দিও। এরা ভারতের নারী, মা ডাকে সব ভুলে শত্রুকেও মাফ করতে এরা জানে।

ইব্রাহিম। আলম খাঁ!

আলম। নইলে মেহেরের মত লক্ষ লক্ষ নারীর অন্তর্নিহিত জ্বালার তীব্র অভিশাপে তুমি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মেহের। আলম খাঁ!

আলম। খোদাকে ডাক মেহের, খোদাকে ডাক। যার অযাচিত করুণায় তুমি দেখেছো দুনিয়ার আলো, যার অকার্পণ্য দানে গড়ে উঠেছে তোমার দেহ, যার অপরিসীম ভালবাসায় আঘাতের মধ্যেও পাওয়া যায় সান্ত্বনার আস্বাদ, সেই বিশ্বনিয়ন্তা মালিকের দরবারে জানাও তোমার অশ্রুসিক্ত বেদনা; এই দুঃখ-তম ভেদ করে তিনিই দেখাবেন হাসির রমজান।

[প্রস্থান।

ইব্রাহিম। মেহের! এসো, কাছে এসো। দুনিয়ার কোন নারী-কেই ইব্রাহিম লোদী ভাল বাসেনি, কিন্তু তোমার রূপের কাছে সে

পরাজয় স্বীকার করেছে। এসো, আমি তোমায় দিল্লীর খাস বেগম করবো।

মেহের। তোমার এ জঘন্য প্রস্তাবে মেহের পদাঘাত করে পশু!

ইব্রাহিম। বহুৎ আচ্ছা! ভেবেছো, আমাকে প্রত্যাখ্যান করে ওই আলম চাচাকে নিয়ে ভাসবে? তা হবে না, শয়তানী! যে স্পর্দ্ধিত জিহ্বা আমাকে পশু বলে সম্বোধন করেছে, আমি তা ছেদন করবো। এই কে আছিস?

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। আদেশ করুন জাঁহাপনা।

ইব্রাহিম। একে নিয়ে যা! এখনি ওর জিভটা কেটে এইখানে নিয়ে আসবি।

মেহের। নির্যাতনের নির্মম চক্রতলে আমাকে পিষে মারলেও তোমার আশা অপূর্ণ থাকবে ইব্রাহিম। কাটো তুমি আমার জিহ্বা, ফেল তুমি আমাকে অগ্নিকুণ্ডে, মার তুমি আমাকে পাথরে আছাড়, তবু আমি কাঁদাবো না—টলবো না—একটি কথাও বলবো না। শুধু আমার জমাট বাঁধা দীর্ঘশ্বাসের একটা হল্কা ছড়িয়ে দিয়ে যাবো তোমার সর্বাঙ্গে, যার অনলে পুড়ে ছাই হবে তুমি আর তোমার এই সুখের প্রাসাদ। [রক্ষী সহ প্রস্থান।

ইব্রাহিম। এঁ্যা, মেহের কি পাথরের তৈরী?

রিজিয়ার প্রবেশ।

রিজিয়া। মেহের—মেহের কই জাঁহাপনা! আমি যে তার গায়ের চামড়া দিয়ে আমার পায়ের জুতি বানাবো।

মেহের। [নেপথ্যে] আঃ— [আর্তনাদ]

ইব্রাহিম। ওই শোন বেগম, মেহেরের করুণ আর্তনাদ! আমি ওর জিভটা কেটে আনবার হুকুম দিয়েছি।

রিজিয়া। বেশ করেছো! তুমি নাও জিভ, আমি নেবো তার গায়ের চামড়া—ভারী মজা হবে।

সদ্যকর্তিত জিহ্বায় রক্তাক্ত মুখে মেহেরের প্রবেশ।

ইব্রাহিম। ওই যে মেহের আসছে—

রিজিয়া। মেহের, আমার রূপের প্রতিদ্বন্দ্বিনী এই কস— [মেহেরকে দেখিয়া নিশ্চল প্রস্তর মূর্তির মত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল এবং ভাল ভাবে তাহার মুখের দিকে দেখিতে লাগিল। কিছু-ক্ষণ পরে শরাহত পক্ষীর ন্যায় আর্তনাদ করিয়া মেহেরকে বুকে জড়াইয়া ধরিল] ওঃ—সুলতান, তুমি করেছো কি?

মেহের। [শুধু রিজিয়ার মুখের দিকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল, কিছু বলিতে গেল কিন্তু পারিল না]

রিজিয়া। [মেহেরকে বক্ষে ধরিয়া উন্মাদিনীর ন্যায়] হাসিনা, ওরে আমার মা-হারা বহিন—

ইব্রাহিম। রিজিয়া! তুমি মেহেরকে চেনো?

রিজিয়া। চিনি শয়তান, চিনি। ওর সঙ্গে যে আমার রক্তের সম্বন্ধ। ওর মনে না থাকলেও আমার মনে আছে। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই কপালে কাটা দাগ, সেই চোখ ঝলসানো রূপ। ওঃ, খোদা!

ইব্রাহিম। মেহের তোমার—?

রিজিয়া। ছোটবোন। মা কবরে গেলে আমাকে পথ থেকে

কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দেয় জালাল খান্। আর আমার এই বোনটি পথেই হারিয়ে যায়। সেদিন আমি ভেবেছিলাম ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে ও হয়তো মরে গেছে! ওঃ! ওরে মেহের—ওরে আমার স্নেহের পুতলা—

ইব্রাহিম। রিজিয়া!

রিজিয়া। চুপ! আমি তোমার মাথাটাই চিবিয়ে খাবো। তোমার গায়ের চামড়া দিয়েই আমার জুতি বানাবো।

ইব্রাহিম। রিজিয়া! আমি তোকে হত্যা করবো কসবী।

রিজিয়া। হত্যা করতে তুমি পারবে না জল্লাদ, রিজিয়ার হাতেই মরতে হবে তোমাকে। আয় বোন আয়। তোকে মাটীর বুকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে আবার আমি পথেই গিয়ে দাঁড়াবো। [মেহেরকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত]

ইব্রাহিম। আমাকে ত্যাগ করে তুমি চলে যাচ্ছো রিজিয়া?

রিজিয়া। কিসের মোহে তোমার মত মড়াকে বুকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকবো সুলতান? এতদিন যে আশায় তোমার কাছে পড়েছিলাম সে আশা আমার মিটেছে। ছায়া বেগমকে শিক্ষা দিয়েছি—তোমারও রক্ত মাংস খেয়েছি, বাকী ক-খানা হাড়? ও বাবরের তোপের মুখেই উড়ে যাবে।

[মেহেরকে লইয়া প্রস্থান।

ইব্রাহিম। রিজিয়া—বেইমানী—

নেপথ্যে। [কামান-গর্জন]

ইব্রাহিম। ওকি! পাণিপথের তোপধ্বনি? মোগল-পাঠান-যুদ্ধের বিজয় সংকেত? ওকি! ওই যে যাদের আমি অকালে মৃত্যুর কোলে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি, তারা সবাই আমার সামনে এসে

বিভীষিকা সৃষ্টি করছে। রক্ষী, প্রহরী, কে আছিস? আমার অস্ত্র নিয়ে আয়। আমি আজ সবাইকে হত্যা করবো। মরার আগে দিল্লীর প্রাসাদখানাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পথের ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে যাবো।

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মেবার-প্রাসাদ।

স্বপ্নোত্থিত অবস্থায় সংগ্রাম সিংহের প্রবেশ।

সংগ্রাম। পাণিপথ—পাণিপথ। পাণিপথের মাঠে সুরু হয়েছে মোগল-পাঠানে তুমুল সংগ্রাম। একদিকে লক্ষ লক্ষ সুলতানী ফৌজ, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় খোরাসানী সৈন্য। একদিকে তীর ধনু বর্শা তলোয়ার, অন্যদিকে আগ্নেয়াস্ত্রের গোলা। মনে হয় এই যুদ্ধেই ভারতের বুক থেকে পাঠান-শক্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কর্ণদেবীর প্রবেশ।

কর্ণ। সৈন্য সাজাও মহারাণা, সৈন্য সাজাও। পাণিপথের অগ্নি-শিখা মেবারের বুকেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

সংগ্রাম। মহারাণি!

কর্ণ। মোগল-পাঠান যে-কেউ পাণিপথ সংগ্রামে জয়ী হোক, মেবারের স্বাধীনতা সে সইতে পারবে না। হিন্দুস্থানের বুকে হিন্দুর উত্থান—এ মুসলমানের সম্পূর্ণ অসহ্য।

সংগ্রাম। তা যদি হয়, তার জন্য চিন্তা কি কর্ণদেবী? মেবারের রণশক্তি তো দুর্বল নয়।

কর্ণ। পাঠানের তুলনায় মেবারের রণশক্তি দুর্বল না হলেও, মোগলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মত তার শক্তি কই মহারাণা?

সংগ্রাম। তুমি আমার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ কর দেবী?

কর্ণ। ভেবে দেখ মহারাণা! মোগলের কামানের মুখে তোমার বীর সৈন্যদল তৃণের মত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

সংগ্রাম। কর্ণদেবীর অনুমান অভ্রান্ত নয়। কিন্তু উপায় কি রাণী?

কর্ণ। নীরব দর্শকের মত পাণিপথের দিকে চেয়ে বসে না থেকে, তুমি আরও সৈন্য সংগ্রহ কর মহারাণা! কোল ভীল সাঁওতাল এমন কি ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তুমি তোমার রণশক্তিকে আরও দৃঢ় কর।

সংগ্রাম। তাই হবে কর্ণদেবী! আমি এখনি সে ব্যবস্থা করছি। কিন্তু রাণী! আমি ভাবছি রহমতের কথা। মেহেরকে উদ্ধার করার জন্য তাকে আমি দিল্লীতে পাঠিয়েছিলাম, সে তো আজও ফিরে এল না।

বস্ত্রাভ্যন্তরে রহমতের ছিন্নশির লইয়া
বিক্রমজিতের প্রবেশ।

বিক্রম। ফিরে এসেছে মহারাণা!

সংগ্রাম। রহমৎ ফিরে এসেছে ?

বিক্রম। এসেছে, তবে সশরীরে নয়—শুধু তার এই কাটা মাথাটা। [ছিন্নশির দেখাইল]

সংগ্রাম। [ছিন্নশির দেখিয়া চমকিত হইলেন] একি ! রহমৎ ! ভাই—বন্ধু ! ওঃ—

বিক্রম। দিল্লীর কারাগারে সে ধরা পড়েছিল। শয়তান ইব্রাহিম লোদী তার মাথাটা কেটে আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে '

সংগ্রাম। [তীরবিদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জন করিয়া] ইব্রাহিম লোদী ! শয়তান ! [বিক্রমজিতকে] বিক্রমজিৎ ! তুমি সে নারকীর অনুচর। তোমাকে—

বিক্রম। আমাকে তুমি ক্ষমা কর সংগাম সিংহ। যে ভুল আমি করেছি, তার জন্ম আমি অনুতপ্ত। বিদেশীর গোলামী ছেড়ে আবার আমি গোয়ালিয়রের রাজা হয়েই বাঁচতে চাই।

কর্ণ। হিন্দু হয়ে মুসলমানের দাসত্ব করার নেশা তোমার কেটে গেছে রায়মশায় ?

বিক্রম। কেটে গেছে মা ! রহমতই আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে।

সংগ্রাম। বিক্রমজিৎ।

বিক্রম। রহমৎ মুসলমান হয়ে যদি হিন্দুর জন্ম জীবন দিতে পারে তাহলে আমি হিন্দু হয়ে তা পারি না কেন ?

সংগ্রাম। রহমৎ হিন্দুর জন্ম জীবন দেয়নি রায়মশায় ! রহমত জীবন দিয়েছে ভারত মায়ের এক বিপন্না কন্তার উদ্ধারে। রহমতের মত স্বদেশপ্রেম যেদিন প্রতিটি হিন্দু-মুসলমানের অন্তরে জেগে উঠবে, সেদিন ওই বিদেশী মোগল-পাঠানকে ভীত ত্রস্ত হয়ে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবেই।

বিক্রম। ঠিক বলেছো বন্ধু! ধর্মের সংকীর্ণতা নিয়ে দেশের বুকে যারা আঘাত করে, স্বার্থের পূজা করতে যারা নিজের ভাইকেও ভুলে যায়, তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু! তুমি আমাকে সেই গুরু-দণ্ডই দাও মহারাণা!

কর্ণ। অনুতাপের আগুনে পুড়ে আপনি খাঁটি সোনা হয়ে গেছেন রায় মশাই! বীরের মত আজ আপনি আপনার ভারতীয় ভাই-এর পাশে এসে দাঁড়ান, অত্যাচারী রাজশক্তির কবল থেকে উদ্ধার করুন আপনার গোয়ালিয়রের স্বাধীনতা।

বিক্রম। সংগ্রাম সিংহ! এতদিন মোহান্ধ হয়ে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে যে অন্যায় আমি করেছি, তার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর ভাই! [পদতলে বসিল]

সংগ্রাম। পদতলে নয় বন্ধু! তুমি ভারতবাসী আমার ভাই। তোমার স্থান আমার বক্ষে— [আলিঙ্গন]

নেপথ্যে। জয় মহারাণা সংগ্রাম সিংহের জয়।

সংগ্রাম। ও কারা জয়ধ্বনি দিচ্ছে মহারাণী?

কর্ণ। আমার নারী-বাহিনীরা।

সংগ্রাম। কর্ণদেবী।

কর্ণ। গোপনে মেবারের সমস্ত নারী শক্তিকে অস্ত্র শিক্ষা দিয়ে তাদের নিয়ে আমি নারী-বাহিনী তৈরী করেছি মহারাণা! দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় নারী পুরুষ সবাই যদি মুক্ত কৃপাণ হাতে নিয়ে মাভৈঃ মন্ত্রে রণক্ষেত্রে ছুটে যেতে পারে, তবেই তো হবে অবসান বিদেশীর রক্তচক্ষের নির্মম শাসন। [প্রস্থান।

সংগ্রাম। [উদ্দেশ্যে] জাগো জাগো ভারতের নারী—বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে থাক তোমাদের দেশরক্ষায় উজ্জ্বল আদর্শ!

নেপথ্যে। জয় মহারাণা সংগ্রাম সিংহের জয়।

সংগ্রাম। ও আবার কাদের জয়ধ্বনি ?

ছুটিয়া উদয়ের প্রবেশ।

উদয়। আমার বালক-সৈন্যরা আপনার জয়ধ্বনি দিচ্ছে পিতা।

সংগ্রাম। উদয় !

উদয়। যার পিতা মেবারের অসংখ্য যুবককে রণশিক্ষায় দীক্ষা দিয়ে জন্মভূমির মর্যাদা রক্ষায় মৃত্যুকে বরণ করতে শিখিয়েছে, যার মা লক্ষ লক্ষ নারীকে অবগুণ্ঠন সরিয়ে দিয়ে অসুর-বিনাশিনী খড়্গ হাতে নিয়ে শত্রুরক্তে স্নান করতে শিখিয়েছে, তাদের পুত্র হয়ে আমি কি ঘুমিয়ে থাকতে পারি ?

সংগ্রাম। [সোল্লাসে] উদয়—পুত্র—

উদয়। আপনার বীর সৈন্যদের নিয়ে মুক্ত রণাঙ্গনে আপনি করবেন শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম, রক্তপিয়াসী চামুণ্ডার মত ভীমা ভয়ঙ্করী রূপে সহস্র নারীসেনা নিয়ে মা রক্ষা করবে, মা-ভগ্নীর সম্মান, আর দূর থেকে আমি আমার বালক-সৈন্যদের নিয়ে তীর চালিয়ে ওই মোগল-পাঠানকে ঘুম পাড়িয়ে দেব মেবার-সীমান্তে ! [প্রস্থানোদ্যত]

সংগ্রাম। কোথা যাস্ পুত্র ?

উদয়। যুদ্ধের মহড়া দিতে পিতা।

সংগ্রাম। ওরে শোন, যুদ্ধের এখনও অনেক বাকী !

উদয়। যুদ্ধ বাকী থাকলেও যুদ্ধ প্রস্তুতিকে বন্ধ রাখলে চলবে না পিতা ! আক্রান্ত হবার আগেই আক্রমণ প্রতিহত করবার শক্তি সঞ্চয় না করলে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না পিতা।

[প্রস্থান।

বিক্রম। ধন্য মহারাণা, শত ধন্য ওই সিংহশিশু উদয়কে—অসংখ্য ধন্যবাদ দিই এই বীরপ্রসবিনী মেবার জননীকে।

দৌলতখানের প্রবেশ।

দৌলত। মহারাণা সংগাম সিংহের জয় হোক!

সংগ্রাম। একি দৌলতখান!

বিক্রম। তোমাকে বাবর মুক্তি দিয়েছে?

দৌলত। কৌশলে আমি তাব শিবিব থেকে পালিয়ে এসেছি মহারাণা! আপনি আর আমি অত্যাচারী ইব্রাহিমকে দমন করার জন্য বাবরকে আহ্বান করেছিলাম। কিন্তু বাবর সে কৃতজ্ঞতা ভুলে গিযে আগেই আমার হাত থেকে পাঞ্জাব ছিনিয়ে নিয়েছে। আজ আমি নিরাশ্রয়—

সংগ্রাম। নিরাশ্রয় কেন বলছো বন্ধু! মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের আশ্রয় তোমার জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত।

দৌলত। দেবে? আমাকে আশ্রয় দেবে? আমি খোদার নামে শপথ করে বলছি দোস্ত! তোমার জন্য আমার জীবন দেব।

সংগ্রাম। আমার জন্য নয় ভাই! যদি প্রয়োজন হয় আমার ভারত মায়ের জন্য তোমরা আমাকে সাহায্য কর। যদি কোনদিন ওই লুণ্ঠনকারী বাবর হিন্দুস্থানের স্বাধীনতায় আঘাত করে, সেদিন তোমরা ভারতের লক্ষ লক্ষ হিন্দুমুসলমান আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে সমস্বরে বল—"জয় ভারত-মায়ের জয়।

বিক্রম ও দৌলত } জয় ভারত-মায়ের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

—— ——

চতুর্থ দৃশ্য।

পাণিপথের পার্শ্ব।

নেপথ্যে। [অবিশ্রান্ত কামান-গর্জন।]

ছায়াবেগমের প্রবেশ।

ছায়া। ইব্রাহিম—ইব্রাহিম—আলম খাঁ, আলম—কারও সাড়া নেই। চারিদিকে শুধু গোলার শব্দ—আর কাতর আর্তনাদ। ওঃ, কি করি! কেমন করে অবোধ ছেলেগুলোকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করি। আমি বেঁচে থাকতে সেকেন্দার শা'র প্রাসাদ মোগল অধিকার করবে—ছেলেগুলোকে নির্মমভাবে হত্যা করবে! ওঃ—না না, যেমন করেই হোক ওদের বাঁচাতেই হবে। ইব্রাহিম—আলম খাঁ—রেজা খাঁ—

রিজিয়ার প্রবেশ।

রিজিয়া। বাজের মত রেজা খাঁ আমার বুক থেকে মেহেরকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। দিলে না—তাকে বুকে করে আমাকে একটু কাঁদতেও দিলে না। [ছায়াবেগমকে দেখিয়া] কে? কে তুমি?

ছায়া। আমি মা! লক্ষ লক্ষ সন্তানের মা। ছেলেগুলো পাণিপথের মাঠে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই তাদের দিল্লীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। তুমি? তুমি কে গা?

রিজিয়া। আমি রাক্ষসী। একটা নয়—দুটো নয়, লাখ—লাখ নরহত্যা করিয়েছি একটা পশুকে দিয়ে। তাই খোদা আমাকে সাজা দিয়েছেন—

ছায়া। তুমি তো দিল্লীর বেগমসাহেবা?

রিজিয়া। চুপ! বেগম রিজিয়া মরে গেছে—আমি তার একটা জলন্ত পোড়া দেহ। বলতে পারো? ইব্রাহিম লোদী কি মরেছে?

ছায়া। খবরদার শয়তানী! ওকথা উচ্চারণ করলে আমি তোর জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলবো।

রিজিয়া। আ-মর বুড়ী, তেলে, বেগুনে জলেই আছে, বলি, ইব্রাহিমের জন্য তোর এত দরদ কেন?

ছায়া। ইব্রাহিমের জন্য দরদ—কেন, তুই জানবি কি? আমি যে তাকে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছিলাম,—সে যে আমার ছেলে।

রিজিয়া। তুমি? তুমি না ছায়া বেগম? তুমি বেঁচে আছো? তোমার যে মরবার কথা! তোমার প্রাণদণ্ড হয়েছিল না?

ছায়া। হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যু আমাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল, জল্লাদের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়লো, রক্ষী আমাকে দেখে শিউরে উঠলো। তারপর কে যে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল রাজ-পথে, সেটা ঠিক মনে নেই। হ্যাঁ, চাবুক এনেছো? চাবুক?

রিজিয়া। চাবুকের কথা আজও মনে আছে? না না, আর আমি তোমাকে চাবুক মারবো না। তুমি আমাকে মাফ করো, ছায়াবেগম। আজই আমি দেশ ছেড়ে চলে যাবো—

ছায়া। চলে যাবে?

রিজিয়া। হ্যাঁ। তবে যাবার সময় একজনের হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে নিয়ে যাবো। দেখছো এই ছুরি। [ছুরি দেখাইল] তারই জন্য মাংসাশী শকুনের মত এই ভাগাড়ের চারিদিকে ওৎ পেতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কে সে জান? তোমার—আমার—দুনিয়ার সেরা দুষমন

সে। তাকে স্নেহ নিংড়ে তুমি দিয়েছো রক্ত—বিনিময়ে সে দিয়েছে তোমাকে অবজ্ঞার ঘৃণিত থুৎকার। তাকে আমি দিয়েছিলাম আমার যৌবনভরা রূপের ডালি, সে দিয়েছে আমায় আমারই বহিনের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে তৈরী এক ঝলক তুষানল। দুনিয়া তাকে দিয়েছিল সন্মানের পাহাড়, সে দিয়েছে দুনিয়াকে নির্যাতনের কশাঘাত। সে কে জান? তোমারই আনন্দদুলাল, সুলতান ইব্রাহিম লোদী। হা-হা-হা—

[প্রস্থান।

ছায়া। বাঁদীর মেয়েটার চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে—কাকে পোড়াবে তাব ঠিক নেই। আমি এখন কি করি! বেলা যতই বেড়ে যাচ্ছে, ততই যে পাঠানগুলো কমে আসছে। ওঃ, রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে পাণিপথের শ্যামল প্রান্তরে! খোদা! তুমি সব নাও—শুধু আমার ইব্রাহিম আর আলম খাঁকে বাঁচিয়ে রাখো মেহেরবান।

আহত ইব্রাহিমের প্রবেশ।

ইব্রাহিম। ইব্রাহিমের প্রাণ ভিক্ষা করে কে খোদার কাছে প্রার্থনা করছে? তামাম হিন্দুস্থানে এমন কে আছে, যে ইব্রাহিম লোদীর মৃত্যু না চায়?

ছায়া। আছে, এমন মানুষ একজন আছে বাবা। যাকে তুমি দিনরাত চাবুক মেরেছিলে।

ইব্রাহিম। [ছায়াবেগমের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া] তুমি?

ছায়া। আহা! মুখখানা যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে রে! চল বাবা, আর যুদ্ধে দরকার নেই, চল—আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাই—

ইব্রাহিম। [চিনিতে পারিয়া] নারি! আমি তোমাকে এত নির্য্যাতন করেছি—তবু তুমি চাও আমার মংগল ?

ছায়া। চাইতেই যে হবে ইব্রাহিম? কুপুত্র যদিও হয়—কুমাতা কি হতে পারে? ওরে, আমি যে মা—

ইব্রাহিম। মা! একটা বাঈজী হবে ইব্রাহিম লোদীর মা? না-না, তা হতে পারে না। ইব্রাহিম আশমান থেকে ঠিকরে পড়েছে, বাঘিনীর দুধ খেয়ে সে মানুষ হয়েছে। দুনিয়ায় মা বলতে তার কেউ নেই। [ক্ষিপ্ত হইয়া] হত্যা—হত্যা—জালাল খানকে হত্যা করেছি, ফেরাগতকে কবরে পাঠিয়েছি, দিল্লীর কোতলখান নরমুণ্ডে পাহাড় জমিয়েছি। যা রাক্ষসী! তোর এই কলুষিত পরিচয় নিয়ে তুইও দুনিয়া ছেড়ে চলে যা—[ছায়াবেগমকে অস্ত্রাঘাত]

ছায়া। আঃ—খোদা—[পড়িয়া গেল]

আলম খাঁর প্রবেশ।

আলম। কি করলে? কি করলে ইব্রাহিম! আজ মৃত্যুর তারে দাঁড়িয়েও তবু হত্যার আস্বাদ ভুলতে পারলে না?

ইব্রাহিম। না। নর রক্তের বিভীষিকা দেখার জন্যই আমার জন্ম। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত, আমি হত্যা করে প্রাণের আশা মেটাতে চাই। তাইতো রেজা খাঁকে হুকুম দিয়েছি—যুদ্ধে যারা আহত হবে, বা প্রাণের ভয়ে পালাতে চাইবে, তাদের এই পাণিপথের মাঠে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

আলম। ওঃ কি নৃশংসতা নিয়েই তোমার জন্ম হয়েছিল পশু! [ছায়াবেগমকে] ভাবি!

ছায়া। [ধীরে ধীরে উঠিয়া] আঃ! আমি যাচ্ছি আলম!

যদি পারো আমার এই দেহটাকে সেকেন্দার শাহের পাশেহ মাটি দিও।

আলম। ভাবি!

ছায়া। জীবনটা আমার কাছে ভারী হয়ে গেছে আলম! এগারো বছর বয়সে ফুলের মত সৌন্দর্য নিয়ে এসেছিলাম দিল্লীর হারেমে, নাচে গানে সেকেন্দার শাহকে ভুলিয়ে সেজেছিলাম বেগম, একথা সত্য—তবে, সাদীর পর থেকে আজ দীর্ঘ যুগাতীত কাল পর্যন্ত আমি, স্বর্গগত সুলতানের বেগমই হয়েছিলাম বাঈজীর হাওয়া আমার গায়ে লাগেনি! নিজের পুত্র না হলেও—তোদের নিয়ে বেশ কাটছিল দিন গুলো—কিন্তু কেন জানি না, কার কাল দৃষ্টিতে আমার সব হারিয়ে গেল! ওঃ—আর নয়। ইব্রাহিম মরার আগেও আমি তোকে আবার বলে যাচ্ছি—আমি বাঈজী নই—আমি তোর মা—খোদাকে জানাই তিনি তোর মংগল করুন।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

আলম। শোন ঘাতক! তুমি যাকে অস্ত্রাঘাত করলে সেও তোমার মংগল কামনা করতে করতে চলে গেল।

ইব্রাহিম। [ক্ষিপ্তের ন্যায়] যাক—সবাই যাবে। আলম খাঁ—তুমি কি আমার মৃত্যু দেখবার জন্য কারাগার ভেঙে পালিয়ে এলে?

আলম। ভাঙবার আগেহ তোমার রক্ষীরা, তোমারই আদেশে আমাকে মুক্তি দিয়েছে।

ইব্রাহিম। [উত্তেজিত হইয়া] ওই যে জালাল খান, কেরামত করিমশাহ সবাই বেইমানি করে বাবরের পক্ষে যোগ দিয়েছে, ওদের সবাইকে আমি জবাই করবো।

আলম। কি বলছো? তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেলে ইব্রাহিম!

ইব্রাহিম। [পূর্ব্ববৎ] বিশ্বাস ঘাতক বিশ্বাস ঘাতক সংগ্রাম সিংহ—দৌলতখান—আলমখাঁ—রিজিয়া—সবাই বিশ্বাস ঘাতক! আমি এদের জীবন্ত কবর দেব। হা—হা—হা—

আলম। ইব্রাহিম এটা রণক্ষেত্র ভুল বকার স্থান এ নয়।

ইব্রাহিম। [পূর্ব্ববৎ] রেজা খাঁ! তীর চালাও বর্শা চালাও লাল করে দাও পাণিপথের মাটি।

আলম। ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম। আলম খাঁ তুমি কি করবে? পাঠানের পক্ষে অস্ত্র ধরবে—না মোগলের দলে যোগ দেবে? বল শয়তান কি করতে চাও?

আলম। আমি কাপুরুষ নই ইব্রাহিম লোদী! যে প্রাণের ভয়ে নিজের জাতির গৌরব মোগলের পায়ে বিলিয়ে দেব। চল ইব্রাহিম! জীবনে কোন পূণ্যকাজ তুমি করনি, আজ জাতীর জন্য জীবন দিয়ে ইতিহাসের বুকে একটা পরিচয় অন্ততঃ রেখে যাও।

ইব্রাহিম। ইতিহাসে আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় যে আমি নারী নির্য্যাতনকারী—অত্যাচারী প্রাণহীন নরঘাতক। হা—হা—হা

আলম। তার উপর আরও একটা পরিচয় তোমার আছে—তুমি কাপুরুষ নও। চল, তোমাকে দেখতে না পেলে সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

ইব্রাহিম। পাণিপথ—পাণিপথ! মোগল পাঠান যুদ্ধের এমন রক্তাক্ত কাহিনী তোর বুকে আঁকা থাকবে—যা, চিরদিন মানব সমাজকে স্তম্ভিত করে দেবে।

নেপথ্যে। [কামান গর্জ্জন]

ইব্রাহিম। [উন্মত্তপ্রায়] কামান গর্জ্জন! মোগলের কামান গর্জ্জন, পাঠানের রণহুংকার। ওরে কে আছিস? বন্ধ কর ওই

তোপধ্বনি, বারো হাজার খোরসানী ফৌজকে পাণিপথের মাঠে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে পাঠানের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দে! জয় চাই—

আলম। ইব্রাহিম! ধৈর্য হারিও না। যে কোন অসতর্ক মূহূর্তে শত্রুর হস্তে তোমার মৃত্যু হতে পারে।

ইব্রাহিম। মৃত্যু? ইব্রাহিম লোদীর মৃত্যু? হা-হা-হা! মরার আগে আমি এই সোনার ভারতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবো—আগ্নেয় গিরির বিস্ফোরণের ভয়ংকর জ্বালায় জ্বালিয়ে দেব, আকাশ বাতাস প্রলয় তুফানের মত উদ্দাম উচ্ছ্বাসে মোগল ফৌজ শুদ্ধ পাণিপথকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবো মহাসমুদ্রের বুকে। রেজা খাঁ—মহম্মদ আলি—কামান দাগ, গুলি চালাও শত্রুর রক্তে রাঙা করে দাও পাঠানের বিজয় নিশান।

[প্রস্থান।

আলম। খোদা! ইব্রাহিম মরুক দুঃখ নেই, আমার অনুরোধ তুমি পাঠানের বিজয় গৌরবকে ম্লান হতে দিওনা মেহেরবান। হে দীন দুনিয়ার মালিক! তোমার দোয়া মাথায় নিয়ে চললাম আমি রণস্থলে। হোক অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষন, বহুক নবরক্তে শোণিত প্রবাহ—আসুক পরাজয়ের ঘনঘোর অন্ধকার, আমি একাই শত্রু সৈন্যকে বিধ্বস্ত করে, লক্ষ লক্ষ মোগলের মৃতদেহে পাহাড় রচনা করে সেই প্রাণহীন শব দেহের উপর দাঁড়িয়ে সগর্বে প্রতিষ্ঠিত করবো পাঠান গৌরব সেকেন্দার শাহের বিজয় পতাকা।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

পাণিপথ-রণস্থল।

যুদ্ধরত রেজা খাঁ ও হুমায়ুনের প্রবেশ।

হুমায়ুন। সাবধান পাঠান সেনানী! অস্ত্র ত্যাগ কর নইলে মরবে।

রেজা। পার—মৃত্যু দিয়েই অস্ত্র কেড়ে নাও।

হুমায়ুন। পাঠানের জয় অসম্ভব।

রেজা। মোগলের পরাজয়ই সম্ভব।

হুমায়ুন। ছত্রভঙ্গ সুলতানী ফৌজ।

রেজা। তবু অমরা যুদ্ধ করবো।

হুমায়ুন। যুদ্ধের আশা এখনও মেটেনি শয়তান?

রেজা। বীরের আশা আমৃত্যু পর্যন্ত মেটে না বেইমান।

হুমায়ুন। [সগর্জ্জনে] পাঠান সেনানী!

রেজা। [সগর্জ্জনে] মোগল সেনাপতি!

হুমায়ুন। এইবার তোমার মৃত্যু!

রেজা। আমার নয় তোমার—

হুমায়ুন। উত্তম, দেখা যাক—

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

যুদ্ধরত আলাম খাঁ ও বাবরের প্রবেশ।

বাবর। আমি তোমার বীরত্বে মুগ্ধ যুবক! অস্ত্র রাখ। তোমাকে আমার প্রধান সৈন্যাপত্যে বরণ করবো।

আলম। তোমার দেওয়া রাজপদে আলম খাঁ পদাঘাত করে।

বাবর। পরিণাম চিন্তা কর যুবক!

আলম। আমার চেয়ে তোমারই সেটা বেশী দরকার।

বাবর। আমার কথা শোন—

আলম। কথা না বলে যুদ্ধ কর—

বাবর। সাধ করে আগুনে ঝাঁপ দিওনা।

আলম। নিজের শির বাঁচাও—

বাবর। তোমার শির এখনি নেমে যাবে।

আলম। আমি তাই চাই।

বাবর। আমি তোমার জীবন ভিক্ষা দিচ্ছি—

আলম। আমি ঘৃণায় তা প্রত্যাখ্যান করছি,

বাবর। বুঝলাম আমার হাতেই তোমার মৃত্যু! [উভয়ের যুদ্ধ]

ইব্রাহিম। [নেপথ্যে] আলম চাচা—

আলম। [যুদ্ধ করিতে করিতে] ভয় নাই ইব্রাহিম! প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ কর—

ইব্রাহিম। [নেপথ্যে] আলম চাচা, সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

আলম। [যুদ্ধ করিতে করিতে] যাক,—আমি ওদের ফিরিয়ে আনবো—যুদ্ধ থামিও না—

বাবর। যুদ্ধ এইবার থামবে—[আলম খাঁর অসতর্ক মুহূর্তে বাবর তাহার বক্ষদেশে অস্ত্রঘাত করিল।]

আলম। ওঃ—[পড়িয়া গেল]

বাবর। অপরাধ নিওনা খোদা! যুদ্ধের নীতি অনুসরণ করেছি মাত্র। আলম খাঁ! তোমার মৃত্যুর জন্য বাবর অনুতপ্ত—কিন্তু উপায় নেই—   [প্রস্থান।

আলম। ওঃ—হ'লনা ইব্রাহিম হ'লনা—শেষ রক্ষা হ'ল না। তুমি আমার শক্র হলেও স্বজাতী, আমার আত্মীয়, ভেবেছিলাম মোগলের হাত থেকে কিছু না পারি, অন্তত তোমার জয়গৌরবটা রক্ষা করবো। কিন্তু হ'ল না। ওঃ দেহটা অবশ হয়ে আসছে। ভালই হ'ল, মোগলের পদতলে পাঠানের স্বাধীন পতাকা লুণ্ঠিত হবার আগে আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। ইব্রাহিম—তোমার মৃত্যু দেখার আগে, আমি মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়ছি—এর জন্য নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলেই মনে করি। ওঃ—ভাবি! মাতৃহারা আলমকে হাত ধরে নিয়ে চল অন্ধকার পিছল পথে আমি একা অসহায়—ইব্রাহিম, বীরের মত মর, কাপুরুষের মত রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিও না! সবাই জানুক সেকেন্দার শাহের বংশধর—যত অপরাধীই হোক—তারা প্রাণের ভয়ে বীরত্বের অপমান করো না। ওঃ—খোদা! একটু শক্তি দাও, পাঠান শিবির পর্য্যন্ত দেহটা টেনে নিয়ে যাবার মত ক্ষমতাটুকু কেড়ে নিও না মেহেরবান! [টলিতে টলিতে প্রস্থান।

ইব্রাহিমের প্রবেশ।

ইব্রাহিম। সব শেষ! রণক্লান্ত বীর সেনারা পাণিপথের মাঠে চির বিশ্রাম লাভ করছে! আমি একা, কি করবো? যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করবো? না'না, দুর্ব্বলতার স্থান ইব্রাহিমের অন্তরে নেই—কে? কে যায়? রেজা খাঁ—

রেজা খাঁর প্রবেশ।

রেজা। জাঁহাপনা!

ইব্রাহিম। তুমি আছো? তুমি আছো? হা-হা-হা তবে আর

ভয় নেই, ইব্রাহিমের পাশে দাঁড়াবার মত একজন যখন আছে তখন আবার আমি জলে উঠবো—দুনিয়াকে পুড়িয়ে ছাই করে দেব।

রেজা। জাঁহাপনা!

ইব্রাহিম। একটা কাজ করতে পারো?

রেজা। আদেশ করুন—

ইব্রাহিম। আমার তাঞ্জামে মেহেরকে বেঁধে রেখেছি ওর গায়ে আগুন ধরিয়ে দিতে পার?

রেজা। [চমকিত হইল] জাঁহাপনা!

ইব্রাহিম। পারবে না?

রেজা। পারবো জনাব! আপনার হুকুমে মানুষের উপর যে অমানুষিক নির্য্যাতন আমি করেছি তার জন্য দুনিয়া আমাকে ঘৃণা করলেও আমি তা গ্রাহ্য করি না! আমি জানি, আমি দাস! আমার দাসত্ব জীবনে বিবেকের দংশন নেই—মনুষ্যত্বের বিচার নেই—পাপপুণ্যের প্রশ্ন ও অবান্তর। আমি শুধু চাই মালিকের আদেশ পালন করতে সে যত কাঠোর যত নির্ম্মম যত কালিমা যুক্তই হোক—আমি তা হাসিমুখে করে যাবো।

ইব্রাহিম। রেজা খাঁ!

রেজা। তার জন্য হাজার দোজাক হাঁ করে আমার দিকে ছুটে আসুক, আমি ফিরেও চাইবো না! দুনিয়া আমার মাথায় কলংকের বোঝা চাপিয়ে দিক—আমার আছে নিজের সান্ত্বনা—আমি নিমকহারাম নই—বেইমান নই—[প্রস্থানোদ্যত।]

ইব্রাহিম। রেজা খাঁ!

রেজা। এই আদেশটাই যেন আপনার শেষ আদেশ হয় জাঁহাপনা! সেলাম—   [প্রস্থান।

ইব্রাহিম। মেহের পুড়বে—আমি দেখবো হা-হা-হা রিজিয়া! তোমার মেহেরকে আমি পুড়িয়ে মারছি—যদি দেখতে চাও ছুটে এস। ইব্রাহিমের কাছে কারও মাফ নাই! খোদারও না। সে যতক্ষণ দুনিয়ায় থাকবে শুধু অত্যাচার, অবিচার, আর্তনাদ, হাহাকার, সব নিয়ে একটা রোমাঞ্চকর ভয়ার্ত আবহাওয়াকে বুকে জড়িয়েই থাকবে। যাতে তার মৃত্যুর পর সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, সবাই বোঝে—অন্ধকারের পর এল নূতন আলোর ছটা,—অন্তরে অন্তরে অনুভব করে ধ্বংসের পর নবসৃষ্টির নবীন উদ্দীপনা!

বাবরের প্রবেশ।

বাবর। এই ধ্বংস স্তূপের মধ্যেই সৃষ্টি হবে তোমার কবর।

ইব্রাহিম। কাবুল-সম্রাট?

বাবর। পাঠান সুলতান?

ইব্রাহিম। অস্ত্র নাও—

বাবর। বন্দীত্ব স্বীকার কর,—আমি জয়ী—

ইব্রাহিম। ইব্রাহিম জীবিত থাকতে নয়!

বাবর। তবে শেষ হোক ইব্রাহিমের দুনিয়ার মেয়াদ।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

রেজা খাঁর প্রবেশ।

রেজা। মেহের জলছে—মূক বধির নিষ্প্রাণ মশালের মত দাউ দাউ করে জলছে। কণ্ঠে নেই যন্ত্রনার আর্তস্বর—মুখে নাই বেদনার ভাষা, বক্ষে নাই ভয়ার্ত শিহরণ। চোখ দুটো দেহের আগুনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে উগরে দিচ্ছে মরুভূমির দিগদাহী অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। ওঃ কি নির্মম আদেশ। ইব্রাহিম তোমার পশুত্বের কাছে

রেজা খাঁ আজ ঋণ মুক্ত! কাজ শেষ—[রিজিয়া আসিয়া পিছন হইতে রেজা খাঁকে ছুরিকাঘাত করিল]

রিজিয়া। তোমারও শেষ—

রেজা। ওঃ—কে? [রিজিয়াকে দেখিয়া] বেগম? ইব্রাহিম-লোদীর বেগম? তুমি আমাকে হত্যা করলে? বাঁচতে দিলে না? ওঃ—শয়তানি! তোকে আর কেউ না চিনলেও আমি চিনতাম—আমি জানতাম যে তোর বেগম সাজার মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা ঘুমন্ত রাক্ষসী। না—ভালই করলে রিজিয়া, মোগলের হাতে মরার চেয়ে তোমার হাতে মরা অনেক ভাল। ওঃ—দোয়া কর খোদা! দোয়া কর।   [টলিতে টলিতে প্রস্থান।

রিজিয়া। শয়তানের অনুচরটাকে শেষ করলাম। এইবার বাকি—

অবসন্ন দেহে টলিতে টলিতে ইব্রাহিমের প্রবেশ। তাহার পিছনে ছবির মত দগ্ধ দেহে ধীরে ধীরে মেহেরের প্রবেশ। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে যেন একটা শ্মশানের অর্দ্ধদগ্ধ শব।

ইব্রাহিম। যাও—যাও—আমি তোমাকে চাই না—আমি তোমাকে সইতে পারছি না। তুমি কে? কোন বীভৎসতার আবর্জনায় জন্ম হয়েছিল তোমার? তুমি কি মানুষ? তুমি সেই? তুমি মেহের? না—না, যাও দূর হও,—আর এগিয়ে এসো না। আমি ভারত সুলতান ইব্রাহিম লোদী। আমি তোমাকে ভয় করি না,—আমি খোদার অস্তিত্ব বিশ্বাস করি না, আমি মানুষের কান্নায় হাসি, দুঃখে হাততালি দিই। যাও সরে যাও। নতুবা বাবরের সঙ্গে তোমাকেও আমি কবরে পাঠিয়ে দেবো।

মেহের। [ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল]

ইব্রাহিম। [উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে] ওকি তবু—তবু আসছো ? আমি মরিনি আমি বেঁচে আছি, আমার অস্ত্র আছে, শক্তি আছে—আমি দুনিয়াকে ধ্বংস করবো—আশমানিটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেব,—বেহেস্তের বুকচিরে আমি দোজাকের অন্ধকারেই নেমে যাব! ওঃ—যাও—যাও—[পড়িয়া গেল ও মূর্চ্ছিত হইল]

রিজিয়া। হা—হা—হা! যাক দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যাক ইব্রাহিম লোদীর নাম। [পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত] হা—হা—হা—প্রতিশোধ—মেহের! দেখছিস,—আমি তোর নির্যাতনের প্রতিশোধ নিয়েছি। চল বোন—চল তোর দেহের জ্বালা—আমার বুকের জ্বালার অবসান করবো, আজ ওই নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

[মেহেরকে লইয়া প্রস্থান।

পতাকা হস্তে বাবর ও হুমায়ুনের প্রবেশ।

বাবর। জয় জয় পাণিপথ যুদ্ধে জয়ী আমি, পরাজিত পাঠান শক্তি নিশ্চিহ্ন প্রায়—[ইব্রাহিমকে দেখিয়া] একি! সুলতান ইব্রাহিম লোদী মৃত?

হুমায়ুন। মনে হয় কেউ গুপ্ত হত্যা করেছে পিতা! দেখছেন না ওর অস্ত্রে রক্তের দাগ নেই অথচ বুকে ক্ষতের চিহ্ন!

বাবর। খোদার কাছে অপরাধীর মাফ নাই পুত্র! আত্মহত্যা করুক অথবা আততায়ীর হাতেই মরুক, এ মৃত্যু ওর প্রাপ্য। পুত্র হুমায়ুন! ইব্রাহিম অত্যাচারী হলেও তার বীরত্বে আমি মুগ্ধ—মানুষ তাকে ভুলে গেলেও ইতিহাস তাকে ভুলবে না। পনের শ' ছাব্বিশ খৃষ্টাব্দের মোগল পাঠান যুদ্ধকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এই যুদ্ধের নাম প্রথম পাণিপথ।

যবনিকা

প্রথম অভিনয় রজনীতে যারা রূপ দিয়েছেন

ইব্রাহিম লোদী—শ্রীসরোজ মুখার্জ্জী।
সংগ্রাম সিংহ—শ্রীতারক চন্দ্র পাল।
উদয়—মাঃ মৃত্যুঞ্জয় দাস ও লতিকা।
দৌলত খাঁ—শ্রীবিশ্বনাথ দাস ও হরিপদ সরদার।
বাবর—শ্রীসব্যসাচী ভট্টাচার্য্য ও গৌর ঘোষ।
হুমায়ুন—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী।
বিক্রমজিৎ—শ্রীদ্বারিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
কেরামৎ—শ্রীনিরাপদ শীল।
আলম খাঁ—শ্রীসুশীল নস্কর।
রেজা খাঁ—শ্রীমনীন্দ্র রায়।
ঈশান—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী
তেজ সিংহ—শ্রীপঞ্চানন দাস।
রহমৎ—শ্রীবিশ্বনাথ মণ্ডল।
বান্দা—শ্রীপ্রণয় কুমার ও সত্য দে।
কর্ণদেবী—শ্রীনিতাই চক্রবর্ত্তী ও তারক ঘোষ।
মেহের—কুমারী অরুণা দাস।
রিজিয়া—বিষ্ণু রাণী ও মোহন মালা।
ছায়াবেগম—শ্রীসনৎ মুখার্জ্জী।

—যন্ত্র সংঘ—

মাষ্টার—পাঁচকড়ি সরদার, গোপীনাথ সেন, শম্ভুনাথ পাল, ভোলানাথ মাল, মাধব দত্ত, মন্মথনাথ নস্কর, লক্ষ্মী নন্দী, মধু নন্দী, সুরেন নন্দী, ইত্যাদি।

ম্যানেজার-শ্রীসনৎ কুমার মুখার্জী। ঐ সহকারী-নিতাই চক্রবর্ত্তী

সুরকার—শ্রীরাজ্যেশ্বর নন্দী।

নাট্য পরিচালক—শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিচালক—শ্রীতুলসী চরণ দত্ত

—যাত্রাদলে অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী—

দস্যু মোহন শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ রায়অপেরায় অভিনীত রোমাঞ্চকর কাল্পনিক নাটক। চুরি, শয়তানী, ভয়, সন্দেহ, হত্যা লুণ্ঠন। মহানগরের বুকে দস্যু মোহনের পৈশাচিকতা। অট্টহাসিতে শাসকের শাসনদণ্ড কম্পিত। নদীগর্ভে বরবেশী সুবর্ণ ও কনেবেশী সুষমার সলিল-সমাধি। পুত্রশোকে মহানগর-প্রতিনিধি রত্নেশ্বরের প্রতিহিংসা। পুত্রহত্যা সন্দেহে প্রভুপুত্র মহানগরের রাজপুত্র সুশান্তের হত্যার উদ্যোগ। কন্যা মুক্তোর আর্তনাদে সুশান্তের কাতর প্রার্থনায় জল্লাদের রক্ত-স্রোতে দস্যু ধ্বংসকারী করালের সৃষ্টি। রাজপুত্রের জীবনরক্ষা ও দস্যু মোহনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। তারপর? দস্যু মোহন কর্তৃক সুষমার নির্যাতন। বালক গোপালের চক্ষু উৎপাটন। রত্নেশ্বর-কন্যা মুক্তো লুণ্ঠন। হিংসাযজ্ঞে রত্নেশ্বরের রক্তে পূর্ণাহুতি দানের কালে করাল কর্তৃক দস্যু মোহন ধৃত। মুক্তো সুশান্ত আর সুবর্ণ সুষমার শুভ মিলন।

কে এই করাল? কে এই দস্যু মোহন?

দেখুন—পড়ুন—অভিনয় করুন। মূল্য—২'৭৫ টাকা।

চম্পানদীর ঘাট সুপ্রসিদ্ধ জনতা অপেরায় সগৌরবে অভিনীত শ্রীগোপীপদ যশ রচিত মর্মস্পর্শী কাল্পনিক নাটক।

যে পুণ্য-সলিলার গর্ভে হিন্দু আর মুসলমান পাশাপাশি অবগাহন স্নানে, স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ দেহমনে ঢেলে দিয়ে আসে স্বীয় দেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার অঞ্জলি—কেমন ক'রে সেখানে হারিয়ে যায় পতিব্রতা পল্লী কুল-বধূর স্বপ্নে ভরা দিনগুলি? কেমন ক'রে ছুটে আসে সশস্ত্রবাহিনী নিয়ে পররাজ্য-লোলুপ কামান্ধ বাহারা সুলতান সৈয়দ আলি? কার চক্রান্তে? মাধবের না হোসেনের? সীতারামপুরের জমিদার কাজি নিজামুদ্দিন কি অশোকের ডাকে সাড়া দেয়নি? সমীর কি তার ভুল বুঝতে পারেনি? সাধনগড়রাজ সত্যজিৎ কি ছুটে যায়নি সীমান্ত আক্রমণকারীদের বাধা দিতে? সুলতান-প্রণয়িনী মদিরা কি সতীত্বনাশের প্রতিশোধ নেয়নি, এ-সবের সমাধান যদি চান তাহলে পড়ুন—অভিনয় করুন "চম্পানদীর ঘাট" দেখবেন, কি দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণা জাগবে দর্শকের মনে। মূল্য—২'৭৫ টাকা।

দীপ চাহে শিখা শ্রীপ্রসাদ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রচিত অপ্রসিদ্ধ কাল্পনিক নাটক। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

দি নিউ আর্টিষ্টিক [illegible] কলিঃ-৬